দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৭১ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা।। ১৪ জানুয়ারি ২০১৯।। ২৯ পৌষ - ১৪২৫।।
যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

পৌষপার্বন ও পিঠেপুলি

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ১৮ সংখ্যা, ২৯ পৌষ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

১৪ জানুয়ারি - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

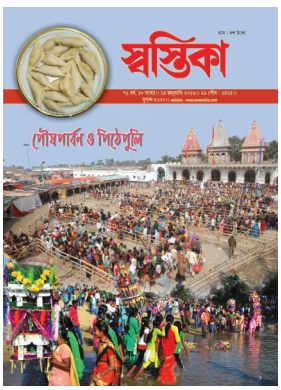

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

বিশ্বাসঘাতক কমিউনিস্টদের কংগ্রেসপ্রীতি
▯ ধীরেন দেবনাথ ▯ ৬

খোলা চিঠি : দিদির ১৮, হয়ে গেল ২৫ ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

রামমন্দির নির্মাণে কে এম মুন্সীর চিন্তাই দিক্‌নির্দেশ করবে
▯ ড. মনমোহন বৈদ্য ▯ ৮

মহাঘোট না হলেও উনিশে ভারতবিরোধী শক্তিগুলির মহাজোট হচ্ছেই ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১০

মমতা জানেন হাটে হাঁড়ি ভাঙার ক্ষমতা রাখেন সুমন
▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ১৩

মোদীর অর্থনীতি 'অচ্ছে দিন' তাড়াহুড়োয় আসে না, ধৈর্য ধরতে হয় ▯ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ▯ ১৫

ঋণ খেলাপীদের শায়েস্তা করতে বদ্ধপরিকর কেন্দ্র
▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৭

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার
▯ দেবব্রত চৌধুরী ▯ ১৮

সাগর সঙ্গমে ▯ বিজয় আঢ্য ▯ ২৩

শ্রী ও সমৃদ্ধির প্রতীক হেমন্তের পৌষলক্ষ্মী
▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ২৫

পৌষের উৎসবের আঙিনায় ▯ সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ২৭

পৌষ সংক্রান্তির পিঠেপুলি ▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ২৯

স্বামীজী গীতাপাঠের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ফুটবল খেলার কথা বলেছেন ▯ ড. রাকেশ দাস ▯ ৩১

যুগ যুগ ধরে গঙ্গাসাগর মানুষের মুক্তির দ্বার
▯ গোবিন্দ চক্রবর্তী ▯ ৩৩

পৌষপার্বণ ও বাংলার কৃষিকৃষ্টি ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৩৫

কংগ্রেসের কৃষিঋণ মকুবের দাবি কি রাজনৈতিক স্বার্থে ?
▯ জি বি রেড্ডি ▯ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯
নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ **চিত্রকথা : ৪০** ▯ **খেলা : ৪১** ▯
অন্যরকম : ৪২ ▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে ২১ জানুয়ারি, ২০১৯

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ২১ জানুয়ারি, ২০১৯

সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পরিবারতন্ত্রের উচ্ছেদ

ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ। সংবিধানের মাধ্যমে এ দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠা অনেকটাই কাগজে-কলমে। কারণ দেশের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের শীর্ষে রয়েছে একেকটি প্রভাবশালী পরিবার। এইসব পরিবারের স্বার্থ দেখতে গিয়ে বারবার উপেক্ষিত হয়েছে দেশের স্বার্থ। বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে দেশের মানুষের সঙ্গে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হবে। বিষয়— সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পরিবারতন্ত্রের উচ্ছেদ। লিখবেন ড. জিষ্ণু বসু। এছাড়া থাকবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ রচনা। লিখবেন প্রণব দত্ত মজুমদার।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

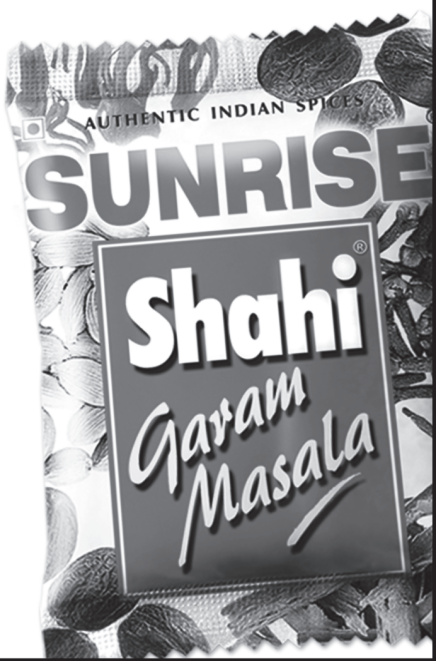

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে’

ধন ধান্যে যখন এই ধরণী সুসজ্জিত, সেই পৌষমাসটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের উৎসবেব সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। কবি লিখিয়াছেন—‘মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল, ঘরেতে আজ কে রবে গো / খোল খোল দুয়ার খোল...।’ সর্বত্রই যেন এক অপার অনাবিল আনন্দ। আসলে এই পৌষমাসটি আমাদের জীবনে বহিয়া আনে সুখ ও সমৃদ্ধির বারতা। কৃষকের মাঠ তখন শস্যে পরিপূর্ণ, গোলায় ধান, কৃষক রমণীর মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। মা লক্ষ্মী তাহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। শ্রীময়ী লক্ষ্মীকে আবাহন করিতে তাহার গৃহের যাবতীয় প্রস্তুতি সারা। সংবৎসর শ্রীময়ী লক্ষ্মী যেন তাহার গৃহে অবস্থান করেন, সংবৎসর যেন সুখে-সমৃদ্ধিতে ভরাইয়া রাখেন তাহার সংসার — পৌষের এই স্নিগ্ধ প্রভাতে, ধান্যশীর্ষের পানে চাহিয়া—ইহাই প্রার্থনা কৃষক রমণীর। এই পৌষ সংক্রান্তিতেই বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পূজিতা হন পৌষলক্ষ্মী। পৌষের এই পার্বণের নামই পৌষপার্বণ। পৌষের এই পুণ্য ক্ষণটিতেই সূর্য ধনু রাশি হইতে মকরে সঞ্চারিত হন। মকর সংক্রান্তি নামেও এই উৎসবটি পরিচিত সাধারণ্যে। এই সুবিশাল সুমহান ভারতবর্ষের কৃষিপ্রধান অঞ্চলে কৃষিজীবী মানুষ মাত্রেই এই সময়টিতে শস্যদেবীকে আবাহন করেন। বাঙ্গালায় এই উৎসব যেমন পৌষপার্বণ, তেমনই কোথাও ইহা পোঙ্গল, কোথাও টুসু, কোথাও বা ভোগলি বিহু। কিন্তু উৎসবের মূল সুর একটিই। বহু শতাব্দী পূর্বে যে সুরটি দেবীর কাছে প্রার্থনায় বাঁধিয়া দিয়াছিলেন ঈশ্বর পাটনি—‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।’

বাঙ্গলার কৃষিপ্রধান সংস্কৃতিতে বিভিন্ন সময়ে লক্ষ্মী আরাধনার একটি পরম্পরা প্রচলিত রহিয়াছে। প্রতি বৃহস্পতিবার বাঙ্গলি গৃহবধূরা পাঁচালি পাঠ করিয়া লক্ষ্মী আরাধনা করন। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে প্রতিটি বাঙ্গলির গৃহে এই ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী পূজিতা হন। সংবৎসর নানা সময়ে এই যে লক্ষ্মী উপাসনার ধারা প্রচলিত রহিয়াছে বাঙ্গলি সমাজে, তার অন্তিম পর্বটিই হইল পৌষপার্বণ। যাহা ধান্যলক্ষ্মীর উপাসনা হিসাবেই বাঙ্গলা এবং বাঙ্গলির হৃদয়ে প্রোথিত। বাঙ্গালার সংস্কৃতিতে ধান্যকে বরাবরই প্রকৃতির দান হিসাবে ভাবা হইয়াছে। মনে করা হইয়াছে, ঈশ্বর তাহার সন্তান-সন্ততিদের দুধে-ভাতে পালন করিবার জন্যই এই বিপুল শস্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পৌষপার্বণের এই উৎসব বাঙ্গালিকে কখনও আত্মকেন্দ্রিক হইতে শিখায় নাই। বরং এই উৎসবের মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে হিন্দু দর্শনের সেই শাশ্বত বাণী—‘সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ।’ সেই কারণেই পৌষপার্বণের পিঠেপুলি আমরা কখনও একা গ্রহণ করি নাই। সকলেই সমভাবে এই প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছি। আমরা প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের তরে—মকর সংক্রান্তির পুণ্য প্রভাতে সেই শিক্ষাই যেন আমরা পরম্পরাভাবে গ্রহণ করি। এই দিনটিতে কৃষক তাহার উৎপাদিত অন্ন একা গ্রহণ করে না। সে আত্মীয়-পরিজন, প্রতিবেশী, চেনা-অচেনা সকলকে, এমনকী পশু-পক্ষী, কীটপতঙ্গকেও এই অন্ন বিলাইয়া দিয়া পরম এক আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ করিয়া থাকে এই ব্রহ্মাণ্ডকে। হিন্দু দর্শন ও সংস্কৃতির ইহাই বৈশিষ্ট্য। এই দর্শন ও সংস্কৃতি সর্বজনীন, সর্বজনের। কোনও গণ্ডিতে, কোনও বিশেষ দেশ-কালে ইহাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। ইহা সর্বব্যাপী, চিরকালীন। তাই ইহা সনাতন। মকর সংক্রান্তি সেই সনাতন ধর্ম, দর্শন এবং সংস্কৃতির কথাই আমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

এই ধরণীমাতাকে রবীন্দ্রনাথ সম্ভাষণ করিয়াছেন—‘অয়ি, ভুবনমনমোহিনী।’ পৌষ এই ভুবনমনমোহিনীর মোহিনী রূপটি আমাদিগের নিকট প্রদান করিয়াছে। সেই মনমোহিনীর চরণে শতকোটি প্রণাম।

সুভাষিতম্

প্রস্তাবসদৃশং বাক্যং প্রস্তাবসদৃশং প্রিয়ম্।
আত্মশক্তি সধং কোপং যো জানাতি স পণ্ডিতঃ।।

কোন সভায় কখন কী বলতে হবে, কার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করতে হবে এবং কোথায় কতটুকু ক্রোধ প্রকাশ করতে হবে, যিনি এসব সম্যক রূপে জানেন তাঁকে জ্ঞানী বলা হয়।

বিশ্বাসঘাতক কমিউনিস্টদের কংগ্রেসপ্রীতি

ধীরেন দেবনাথ

'ফার্স্ট সেভ ইন্ডিয়া, দেন চেনজ্ ইন্ডিয়া'। একথার মর্মার্থ হলো আগে ভারতকে বাঁচাও, তারপর ভারতকে পরিবর্তন কর। গত ১৩ ডিসেম্বর কলকাতায় ফরোয়ার্ড ব্লকের পার্টি কংগ্রেসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে এহেন কথা বলেছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। তাঁর বক্তব্যটি মূলত রাজনৈতিক এবং সেটি নিঃসন্দেহ বিজেপিকে উদ্দেশ্য করে। তিনি কেন্দ্রের ক্ষমতা থেকে নরেন্দ্র মোদীকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করার কথাই বলেছেন। কিছুদিন আগে ফরোয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ এক বিবৃতিতে বলেছেন, আসন্ন লোকসভা ভোটে সিপিএম কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে লড়লে ফরোয়ার্ড ব্লক এককভাবে লড়বে। সম্ভবত সেই কথাকে মাথায় রেখেই ইয়েচুরি ওই মন্তব্য করেছেন। আর সেই মন্তব্য থেকে তিনি ফরোয়ার্ড ব্লককে এই বার্তাই দিতে চেয়েছেন যে, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো রক্ষায় ঐক্যবদ্ধভাবে বামপন্থীদের উচিত কংগ্রেসের হাত ধরা। কারণ কংগ্রেস নাকি ধর্মনিরপেক্ষ দল। তাই কংগ্রেস জোট (ইউপিএ) বিজেপির জোট (এনডিএ)-কে নির্বাচনে হারিয়ে ক্ষমতাসীন হলে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা পাবে এবং সেই অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন আরও ত্বরান্বিত হবে। চমৎকার, কী বিচিত্র ভারতের কমিউনিস্টরা!

সত্যি বলতে কী, মার্কস্- লেনিন-স্ট্যালিন ও মাওয়ের ভাবশিষ্য কমিউনিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতা, দেশদ্রোহিতা ও সুবিধাবাদের ইতিহাস বড়ো দীর্ঘ। চিরদিন এরা চীন-রাশিয়ার দালালি করে এসেছেন এবং ভারতবাসীর সঙ্গে করে এসেছেন বেইমানি। এদের কাছে ভারত মাতৃভূমি নয়, ভোগভূমি। আর চীন-রাশিয়া এদের পিতৃভূমি। এদের চরিত্র প্রথম ধরা পড়ে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর। এই দিন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই)-র জন্ম হয় ভারতের মাটিতে নয়, রাশিয়ার তাসখন্দে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পিঠে তারা প্রথম ছুরি মারে ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে। সেই আন্দালন দমনে ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ ও মিলিটারি ব্যাপক দমনপীড়ন চালায়। গুলিতে হতাহত করেছিল হাজার হাজার মানুষকে। কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল দেশের প্রথম সারির নেতাদের। সমস্ত পার্টি নিষিদ্ধ হয়। এরকম সময়ে দেশের কমিউনিস্টরা ডিগবাজি খায়। তখন তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই রাতারাতি হয়ে যায় 'জনযুদ্ধ'। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ইংরেজ সরকার কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। তখন তারা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং ইংরেজদের পক্ষে মানুষের মধ্যে নির্লজ্জ প্রচার চালাতে থাকে। ঐতিহাসিকদের মতে, এর অন্যতম কারণ হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি জোটে রাশিয়ার যোগদান। অর্থাৎ ব্রিটেন তখন তাদের জ্ঞাতিভাই হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রাশিয়ার শত্রু জার্মানি ও জাপানের সহযোগিতায় ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করলে কমিউনিস্টরা সেদিন নেতাজীর বিরুদ্ধে নানা কুরুচিকর শব্দ যেমন— কুইসলিং, বিশ্বাসঘাতক, আক্রমণকারী, ভণ্ড, ফ্যাসিস্টদের দালাল তোজোর কুকুর ইত্যাদি ব্যবহার করে। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর ফৌজদের তারা অভিহিত করত লুঠেরা, দস্যু, তস্করবাহিনী রূপে। তাদের 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় নেতাজীর নানা অশালীন ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হতো। এরাই তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ প্রচার করত। এরা ছিল ভারতের স্বাধীনতার পুরোপুরি বিরোধী।

কিন্তু এরা মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন করে বলেছে,'পাকিস্তানের দাবি ন্যায্য দাবি। পাকিস্তান মানতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে' ইত্যাদি। আবার খণ্ডিতভাবে হলেও ভারতের স্বাধীনতাকে এরা ব্যঙ্গ করেছে। বলেছে,'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়।' এরা গান্ধীজীকেও ছাড়েনি, ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছে, বলেছে ফ্যাসিস্টদের দালাল। এরা ভারতের মনীষীদেরও ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে মৃগীরোগী ও স্বামী বিবেকানন্দকে ভণ্ড সন্ন্যাসী বলেছে। ১৯৬২ সালের চীনা আগ্রাসনকে এরা স্বীকার করে না। বলে চীন নয়, ভারতই চীন আক্রমণ করেছে। এদের রাশিয়া প্রীতি এতটাই যে রাশিয়ায় বৃষ্টি পড়লে এরা এদেশে ছাতা মাথায় দেয়।

স্বাধীন ভারতের সংসদে এই কমিউনিস্টরাই ছিল প্রধান বিরোধী দল। তারাই আজ বিলুপ্তির পথে। একদা যে কমিউনিস্টরা কংগ্রেসিদের বলত বুর্জোয়া, বোফর্স কেলেঙ্কারি নিয়ে দেওয়ালে দেওয়ালে লিখত, 'গলি গলি মেঁ শোর হ্যায়, রাজীব গান্ধী চোর হ্যায়', তারাই আজ কংগ্রেসের হাত ধরে অস্তিত্ব রক্ষা করতে চাইছে। কংগ্রেস আজ এদের পরম বন্ধু। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! ■

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা

দিদির ১৮, হয়ে গেল ২৫

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

নতুন বছরের শুভেচ্ছা। কিন্তু আঠারো কেমন কাটল! মুখ্যমন্ত্রী যে আইন আদালতে ভরসা রাখেন সেটা অবশ্য আঠারো নতুন করে জানালো।

জামাইষষ্ঠীর দিনে সুখবর দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য দিয়েছিলেন বড়ো খবর। সেই ঘোষণা অনুযায়ী ১ জানুয়ারি থেকে আরও ১৮ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) পাবেন সরকারি কর্মীরা। তবে শুধু ১৮ শতাংশ ডিএ-ই নয়, সেই সঙ্গে ১০ শতাংশ ইন্টেরিম রিলিফ মিলবে। যার ফলে বেতনে ডিএ-র পরিমাণ ১২৫ শতাংশ হবে বলে দাবি সরকারের।

ডিএ কর্মীদের অধিকার কি না, তা নিয়ে চলছে মামলা। স্যাটের পরে হাইকোর্ট হয়ে ফের শুনানি চলছে স্যাটে। সেই লড়াইয়ের মধ্যেই বাড়ছে ডিএ। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি সরকার-পোষিত বিভিন্ন পুরসভা, পঞ্চায়েত, নিগম ইত্যাদির কর্মচারীরা ডিএ পাবেন। বর্ধিত ডিএ পাবেন স্কুল ও কলেজ শিক্ষক এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরাও। সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে আট লাখ কর্মচারী বাড়তি সুবিধা পাবেন।

সাধারণত ডিএ ঘোষণার পরে পরেই তা কার্যকর হয়। কিন্তু এ বার ছ' মাস আগেই তা ঘোষণা করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘোষণার দিনে মুখ্যমন্ত্রী

বলেন, ''কঠিন আর্থিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। ২ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা দেনা শোধ করেছি। এ বছর থেকে ৪৬ হাজার কোটি টাকা ঋণ শোধ করতে হবে। উন্নয়নমূলক একাধিক প্রকল্প চলছে। সব কিছু করে আমরা ৯০ শতাংশ করলাম। সিপিএম সরকার ৩৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দিতে পেরেছিল।''

রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা এখন ১০০ শতাংশ ডিএ পান। সরকারের দাবি, নতুন করে ১৮ শতাংশ ডিএ এবং মূল বেতনের যে ১০ শতাংশ 'ইন্টেরিম রিলিফ' (অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা) দেওয়া হচ্ছে, তা ৭ শতাংশ ডিএ-র সমান। ফলে ১ জানুয়ারি থেকে ডিএ-র পরিমাণ হবে ১২৫ শতাংশ। এর ফলে প্রতি বছর অতিরিক্ত পাঁচ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে সরকারের।

কিন্তু এই দাবি নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। বিরোধী কর্মচারী সংগঠনগুলির বক্তব্য, বেতন কমিশন চালু করতে না পারলে এককালীন ১০ শতাংশ 'ইন্টেরিম রিলিফ' দেওয়া হয়। সেটাকে মহার্ঘ ভাতার সমতুল বলা যায় না।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি ১২৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দিয়ে সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করে কেন্দ্র। তখন রাজ্যে ডিএ ছিল ৭৫ শতাংশ। ২০১৭ সালে ১০ এবং ২০১৮ সালে ১৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দেওয়ায় এখন তা ১০০ শতাংশ হয়েছে। বিরোধীদের হিসেব বলছে, জানুয়ারিতে নয়া ডিএ চালু হলেও কেন্দ্রের থেকে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা ৪৯ শতাংশ কম ডিএ পাবেন।

বাজারি সংবাদপত্র এই হিসেব কেন দেখাচ্ছে না কে জানে!

—**সুন্দর মৌলিক**

রামমন্দির নির্মাণে কে এম মুন্সীর চিন্তাই দিক্‌নির্দেশ করবে

অতিথি কলম

ড. মনমোহন বৈদ্য

রামমন্দিরের জমি সংক্রান্ত বিবাদ ও সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণ নিয়ে বিতর্ক দুটি বিষয় চরিত্রগত ভাবে আলাদা। কিন্তু রামমন্দিরের জমি সংক্রান্ত মামলা সূত্রে সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত নিতে ঢিলেমি ও সরাসরি 'ধীরে চলো' নীতি অবলম্বন আমাকে ১৯৪৮-এর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ওই সময়ে এক স্মরণীয় বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও আর এক বিদগ্ধ পণ্ডিত কে এম মুন্সীর মধ্যে। মুসলমান আক্রমণকারীদের ধ্বংস করা অপরূপ সৌন্দর্যের সোমনাথ মন্দিরের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন মুন্সীজী। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মধ্যে চলা বিতর্ক বিবরণী পুঙ্খানুপুঙ্খ লিপিবদ্ধ করে গেছেন মুন্সীজী তাঁর স্মরণীয় 'Pilgrimage to Freedom' বা 'স্বাধীনতার দিকে তীর্থযাত্রা' গ্রন্থে। কিছু উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

'খানিকটা তীর্থ করতে যাওয়ার মানসিকতা নিয়েই ১৯২২ সালের এক ডিসেম্বরে আমি সোমনাথের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছিলাম। গন্তব্যে পৌঁছে দেখলাম লুণ্ঠিত, অপবিত্র, দগ্ধ ও তছনছ হয়ে যাওয়া একটি মন্দিরের রূপরেখা। আশ্চর্যের কথা সেই অবশিষ্টাংশ কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন এটাই জানান দিতে যে আমরা কতটাই অপদস্থ হয়েছিলাম এবং একই সঙ্গে আমরা কতটা অকৃতজ্ঞও বটে। এক সময়ের মহিমামণ্ডিত এই মন্দিরের বিধ্বস্ত সভামণ্ডপের অংশ দিয়ে যেতে যেতে সেই শীত প্রত্যুষে আমি অন্তরে যে জ্বালা অনুভব করেছিলাম তা আজ আর কথার মাধ্যমে বোঝাতে পারব না।

''১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসের শেষাশেষি সময়টায় আমি সর্দারের সঙ্গে ছিলাম (বল্লভভাই প্যাটেল)। এই সময় হঠাৎ একটা টেলিফোন এল। সর্দার কথা বললেন। তাঁর মুখ চোখে খুশি অনুভব করেছিলাম। কথা শেষ হতে তিনি বললেন স্যার শাহনাওয়াজ ভুট্টো (জুলফিকার ভুট্টোর বাবা) ভারতীয় সেনাবাহিনীকে তদানীন্তন স্বাধীন রাজ্য জুনাগড় অধিকার করার অনুরোধ জানিয়েছেন। ব্যস, এর মানেই হচ্ছে 'জয় সোমনাথ'।''

সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের সূচনা হয়েছিল স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের হাতে। প্রকল্পটিকে হাতে কলমে রূপ দিয়েছিলেন মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য কে এম মুন্সী। মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ। কিন্তু এ কাজে বাধা এসেছিল। মুন্সী লিখছেন, ১৯৪৭-এর নভেম্বরে সর্দার প্যাটেল সোমনাথ মন্দির স্থলে গিয়েছিলেন। সেখানকার এক জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন ''আজকের এই পুণ্যদিনে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণ হওয়া উচিত। হ্যাঁ, আপনারা সৌরাষ্ট্রের লোকেরা এই বিষয়ে আপনাদের মন প্রাণ ঢেলে কাজ করবেন।'' তাঁর বিশ্বাস ব্যক্ত করে মুন্সী লিখছেন, ''সোমনাথের মন্দির শুধুমাত্র একটি প্রাচীন মন্দির এটাই শেষ কথা নয়। সারা দেশবাসীর অন্তরে এই মন্দিরের অনুকরণ রয়েছে তাই এ মন্দিরের পুনর্নির্মাণ একটি জাতীয় প্রতিজ্ঞা।''

প্রধানমন্ত্রীর কথোপকথন উল্লেখ করে তিনি বলছেন— ''জওহরলাল আমাকে ডেকে বললেন তিনি আমার কাজকর্ম মোটেই পছন্দ করছেন না। সোমনাথের পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে হিন্দু পুনরুত্থানকেই (Hindu Revivalism) প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।'' প্যাটেল-মুন্সী ও নেহরুর মধ্যেকার মতপার্থক্য দুটি ভারতের রূপকল্পনাকে আমাদের সামনে দাঁড় করায়। পণ্ডিত নেহরু ভারত-বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর ভারত-ভাবনার মূল ছিল ইউরোপীয় ধ্যান ধারণার অনুসারী। অন্য ভারতটি ছিল দেশের মাটিতে প্রথিত আমাদের প্রাচীন অধ্যাত্মিক পরম্পরার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী। এই সময়েই মুন্সী পণ্ডিত নেহরুকে একটি চিঠিতে লেখেন।

'সোমনাথ সংক্রান্ত গোটা পরিকল্পনাটি সর্দার বাপুর (মহাত্মা গান্ধী) সঙ্গে আলোচনা করার পর বাপু রাজি হয়েছেন। তবে তিনি বলেছেন মন্দির নির্মাণের অর্থ জনগণের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। এর পরই ভারত সরকারের তরফে মন্দির নির্মাণের খরচ দেওয়ার প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হয়। আপনি মন্ত্রীসভার মধ্যে আমাকে সোমনাথের সঙ্গে যুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। আমি এতে খুবই খুশি হয়েছি, কেননা আমি কখনও আমার ভাবনা বা কাজকর্ম গোপন করি না। বিশেষ করে আপনার কাছ থেকে তো নয়ই, কেননা বিগত কয়েক মাস ধরে আপনি আমার ওপর অগাধ আস্থা রেখেছেন। আমি ইতিমধ্যেই বহু সংস্থা স্থাপনে সাহায্য করেছি। ঠিক একইভাবে আমি এখন সোমনাথকে একটি ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছি। এখানে একই সঙ্গে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় ও খামার। সোমনাথ সংক্রান্ত বিষয়ে আমার বিশ্লেষণে আমি আপনাকে নিশ্চিন্ত করতে পারি যে গোটা জাতির যে যৌথ অবচেতন (Collective Subconscious) তা আজ সুখী। মন্দিরের পুনর্নির্মাণের কাজ যে সরকারের অনুমোদনে এগিয়ে চলছে তা আজ দেশবাসীকে দ্বিগুণ আনন্দিত করেছে। 'এর পরের অংশটি ছিল ''গতকাল আপনি আমাকে হিন্দু পুনরুত্থানের কথা বলেছিলেন। হ্যাঁ, আমি অবশ্যই জানি এ সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কী। আমি বরাবরই কিন্তু আপনার ভাবনাকে মর্যাদা দিয়ে এসেছি। আজ আমি আশা করব আপনি আমার ভাবনাকেও সমমর্যাদাই দেবে।

'ভারতবর্ষে দীর্ঘদিনের বহু প্রচলিত রীতি

ও আচার রয়েছে। এর অনেক কিছুকেই আমি নিজস্ব বিনম্র পদ্ধতিতে যেমন--- লেখালিখির মাধ্যমে বা সমাজের মধ্যে কাজের মাধ্যমে এমনভাবে ঘষে মেজে নেওয়ার চেষ্টা করেছি যাতে হিন্দুত্বের মূলভূত কিছু বিষয় যা ভারতবর্ষকে আধুনিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আরও বেশি সংহত ও প্রাণবন্ত একটি জাতিতে পরিণত করতে পারে। আমাদের অতীতের ওপর আমার বিশ্বাস দৃঢ় থাকার ফলেই আমি অনাগত ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানে বাড়তি শক্তিতে কাজ করে চলেছি। আমাদের নবলব্ধ-স্বাধীনতা যদি ভগবদ্ গীতাকে যথাযথ মূল্য না দেয় কিংবা আমাদের যে কোটি কোটি ভক্তিমান নাগরিক মন্দিরগুলির প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়, তাদের সেই বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করে সেক্ষেত্রে সেই স্বাধীনতার তিলমাত্র মূল্য আমার কাছে নেই। কেনন চিরাচরিত শ্রদ্ধা বিন্দুগুলিতে আঘাত করলে আমাদের জীবন ধারনের প্রকৃতিকেই ধ্বংস করে দেওয়া হবে।'

সেই সময় ভি. পি. মেনন যিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপদেষ্টা ছিলেন তিনি এর উত্তরে লিখলেন— ''আমি আপনার অসামান্য চিঠিটি পড়েছি। আমার নিজের কথা বলতে গেলে বলবো যে, আপনি যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তার ওপর ভিত্তি করেই আমি আমার জীবনযাপন করছি এবং প্রয়োজন হলে যদি সেই বিশ্বাসে কোনও আঘাত পড়ে সেক্ষেত্রে আমি মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত আছি।''

মন্দিরের পুনর্নির্মাণের কাজ এরপর এগিয়ে চলল। মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপনের সময় সমাগত হলে ড. মুন্সী রাজেন্দ্রপ্রসাদকে এই অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করলেন। সঙ্গে তিনি একথা জানাতেও দ্বিধা করলেন না যে যদি যথার্থই তিনি যেতে পারেন তবেই যেন তিনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। মুন্সী লিখছেন— ''রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি যাবেন ও বিগ্রহের পুনঃস্থাপনা করবেন তাতে প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের যতই না দ্বিমত থাকুক।'' তিনি আরও জানান— 'যে কোনও মসজিদ বা চার্চ উদ্বোধনেও যদি তাঁকে নিয়মমাফিক ডাকা

বিগত ৬০ বছরে নেহরু মতের অনুসারী একটিমাত্র দলের শাসনে বিদ্বজ্জন ও শিক্ষাজগতের মধ্যে একটি মাত্রই দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে সরকারের সরাসরি প্রশ্রয়ে। আজ রামমন্দির নির্মাণের বিরোধিতা সেই অতীত ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি।

হয় যেখানেও যেতে তাঁর আপত্তি থাকবে না।' এদিকে যখন রাজেন্দ্রপ্রসাদের দ্বারা মন্দির উদ্ঘাটনের কথা ঘোষণা হয়ে গেল তখন তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন জওহরলাল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন। সমস্ত বড়ো কাগজে তাঁর বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সরকারের সব রকমের মুখপত্রে এ ভাষণের কোনও উল্লেখ ছিল না।

ভারতীয় উদারবাদ ও বাক্স্বাধীনতার প্রধান প্রবক্তা সেদিন রাষ্ট্রপতির ভাষণ পর্যন্ত সেন্সর করতে দ্বিধা করেননি এটিই ভাগ্যের পরিহাস। এই বাধা বিপত্তি কাটিয়ে সোমনাথ সেদিন মাথা তুলেছিল। এই সুদৃশ্য মন্দির দর্শনে সারা বিশ্ব থেকে ভক্তজন নিত্য সেখানে সমাগত হন।

তবুও বিগত ৬০ বছরে নেহরু মতের অনুসারী একটিমাত্র দলের শাসনে বিদ্বজ্জন ও শিক্ষাজগতের মধ্যে একটি মাত্রই দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে সরকারের সরাসরি প্রশ্রয়ে। আজ রামমন্দির নির্মাণের বিরোধিতা সেই অতীত ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি।

কিন্তু বিরোধিতা যতই হোক না কেন যে কোটি কোটি ভারতবাসী যাঁরা একটি সংহত ও চিরায়ত ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিতে আস্থাবান তাঁরা সেই 'যৌথ অবচেতনার ভারতীয়ত্বকে' হৃদয়ে ধরে রেখেছেন। বর্তমান ভারতের রূপকার সেই দূরদর্শী প্রজ্ঞাবানদের তালিকায় ছিলেন সর্দার প্যাটেল, কে এম মুন্সী, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, মহাত্মা গান্ধী, ড. রাধাকৃষ্ণন, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মতো আরও অনেকে। এ থেকে আরও বিশদে জানতে চিঠিগুলি পড়তে কৌতূহলীরা ড. কে এম মুন্সীর এক জীবনের কাজ 'Pilgrimage to Freedom' গ্রন্থের (৫৫৯ থেকে ৫৬৬) পাতায় নজর দিতে পারেন।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ)

মহাঘোট না হলেও উনিশে ভারতবিরোধী শক্তিগুলির মহাজোট হচ্ছেই

সাধন কুমার পাল

স্বাধীনোত্তর ভারতে ভারতীয় জনতা পার্টির জন্মই হয়েছিল ইউরোপিয়ান, রাশিয়ান, আরেবিয়ান ভাবরসে জারিত কংগ্রেসি ভাবধারার কবল থেকে এই দেশকে মুক্ত করতে। কোনও ব্যক্তি বা পরিবারকে মহিমান্বিত করতে নয়, হিন্দুত্ব ও একাত্ম মানবদর্শনের ভিত্তিতে ভারতের পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়াটিকে দেশের রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসার লক্ষ্য নিয়েই ভারতীয় জনতা পার্টির যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালে। অনেক লড়াই, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে ইতিহাস রচনা হলো। স্বাধীনোত্তর ভারতে সর্বপ্রথম বিজেপির মতো কোনও অকংগ্রেসি দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল করল। কংগ্রেস মুক্ত ভারতের স্লোগান মোদীজীর মুখ থেকে বের হলেও এটি আসলে ভারতাত্মারই কণ্ঠস্বর। তা না হলে ভারতের মতো এত বড়ো বৈচিত্র্যময় দেশে কোনও একটি দলের পক্ষে একক ভাবে ক্ষমতা দখল করা অসম্ভব ব্যাপার। স্বাধীনতার পর থেকে মানুষ এটা ভাবতেই অভ্যস্ত ছিল যে ভোটের রাজনীতিতে কোনও সরকারের পক্ষেই সস্তা বিতরণের রাজনীতির বাইরে এসে দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণকর কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। শিল্পপতি ব্যবসায়ী চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। বছরের পর বছর ধরে গড়ে ওঠা একটি কায়েমি স্বার্থজাত অচলায়তনে আঘাত হানার জন্য নোট বাতিল, জিএসটির মতো কঠোর সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করে এই সরকার প্রমাণ করে দিয়েছে সবার উপরে দেশ ও মানুষের কল্যাণ সত্য, তার উপরে নেই। দেশের ভিতরে বাইরে নেওয়া বিভিন্ন বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলে উন্নয়নশীল দেশের তকমা মুছে উন্নতদেশের সারিতে বসে ভারত যে আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিতে পারে, এই বিশ্বাস মানুষের মনে আসতে শুরু করেছে। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হলে এবং দেশে সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি চালু করতে গেলে আরও সময় দরকার। সেজন্য দু' হাজার উনিশে আরও শক্তিশালী হয়ে বিজেপির ক্ষমতায় ফেরা দরকার। এমন একটি প্রেক্ষাপটে তিনটি রাজ্য থেকে ক্ষমতাচ্যুত হলো বিজেপি। যেন এক হতাশাজনক পরিস্থিতি। হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্যের ভোটের ফলাফল বলছে জনতা জনার্দন ক্ষমতার মোহে মোহগ্রস্তদের চৈতন্য ফেরানোর জন্য ক্ষমতাচ্যুত করে তীব্র আঘাত হানলেও বিজেপিকে পরিত্যাগ করেনি।

উনিশের লোকসভা নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের কতটা প্রভাব পড়বে এই নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। বিজেপির রাজনৈতিক ভাগ্য গড়তে এই তিন রাজ্য সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। ২০০৪, ২০০৯ এবং ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির মোট প্রাপ্ত ভোটের এক পঞ্চমাংশেরও বেশি ভোট এই তিনটি রাজ্য থেকে এসেছে। ২০১৪ সালে এই তিনটি রাজ্য থেকে ৬৫টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৬২টি আসন বিজেপির ঝুলিতে গেছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই তিন রাজ্য হাতছাড়া হওয়ার পর বিজেপি এক বড়ো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে যে সমস্ত জনমত সমীক্ষা হয়েছে তাতে অবশ্য এই বিষয়টিও উঠে এসেছিল যে বিধানসভা নির্বাচনে ভোট যেখানেই যাক না কেন লোকসভার ক্ষেত্রে প্রথম পছন্দের দল বিজেপি। এই সমস্ত ওপিনিয়ন পোলের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অনুমান পাওয়ার একমাত্র পথ সদ্য সমাপ্ত বিধানসভার ফলাফলের সঠিক বিশ্লেষণ এবং পূর্বধারণা বর্জিত বাস্তব পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ।

কিছু প্রশ্ন এই মুহূর্তে আলোচনা হওয়া অত্যন্ত জরুরি। এক, দেশকে সমৃদ্ধিশালী করতে নেওয়া কঠিন সিদ্ধান্তে, তেতো ওষুধ খেয়ে আরোগ্যলাভের মতো মানুষের সাময়িক কিছু সমস্যা হতে থাকে। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর এনডিএ সরকার নিমপাতা চিবোনোর মতো অনেকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে নোট বাতিল, জিএসটির মতো আপাত অপ্রিয় সিদ্ধান্তগুলির জন্যই কি হিন্দি বলয়ের সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে বিজেপি ধাক্কা খেল?

তিন রাজ্যের বিজেপির পরাজয় বিরোধী শিবিরকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। প্রায় সমস্ত আঞ্চলিক দলই কংগ্রেসের ছোঁয়া এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। মমতা, মায়াবতী, অখিলেশ যাদব, চন্দ্রবাবু নাইডু এরা সবাই কেন্দ্রে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকায়। আবার অনেকে প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হচ্ছে।

দেশ রসাতলে গেলেও এই সমস্ত সাময়িক সমস্যাগুলি নিয়ে মাঠে নেমে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার স্বপ্ন দেখছে কংগ্রেসের মতো ট্র্যাডিশানাল রাজনৈতিক দলগুলি। নোট বাতিলের সময় ব্যাঙ্ক এটিএমের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়ানো মানুষের সমস্যা নিয়ে রাহুল গান্ধী, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মমতা ব্যানার্জির মতো নেতারা লোক খেপিয়ে দেশে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি করে প্রভাব বিস্তারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু মানুষ সাড়া দেয়নি। নোটবাতিলের পরপরই উত্তর প্রদেশে বিপুল জনমত পেয়ে ক্ষমতায় আসীন হওয়া কিংবা গুজরাটে আবার ক্ষমতা ফিরে পাওয়া প্রমাণ করে যে বৃহত্তর স্বার্থে মানুষ এই সমস্ত সিদ্ধান্তের জেরে সাময়িক কষ্ট সইতে রাজি। বরং বলতে হবে কানের কাছ দিয়ে ক্ষমতা হারালেও মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে বিজেপির ভালো ফলের কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের এই

সমস্ত কঠোর সিদ্ধান্ত। বিভিন্ন জনমত সমীক্ষায়ও এই বিষয়টি উঠে এসেছিল যে যাঁরা কংগ্রেসকে ভোট দেবেন বলে মনস্থির করে ফেলেছেন তাঁরাও জানিয়েছেন যে লোকসভার ভোট বিজেপির ঝুলিতেই যাবে।

দুই, সদ্য অনুষ্ঠিত পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে কংগ্রেসের তরফ থেকে কৃষকের ঋণ মকুব থেকে শুরু করে নানা সস্তা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভোটে জেতার জন্য কংগ্রেস আবার সেই পাইয়ে দেওয়ার সস্তা রাজনীতির যুগ ফিরিয়ে আনার মরিয়া প্রয়াস চালিয়েছে। রাহুল গান্ধীকে ক্যারিশ্মাটিক নেতা হিসেবে তুলে ধরার সবরকম প্রয়াস চালানো হয়েছে।

তবে খ্রিস্টান মিশনারি, বিভিন্ন ইসলামিক জেহাদি গোষ্ঠী এবং মাওবাদীরা এবার প্রত্যক্ষ ভাবে কংগ্রেসের পক্ষে প্রচার চালিয়েছে। অর্থও বিলিয়েছে দেদার। দু'চার কেজি চাল আটার জন্য মানুষ যে এই সমস্ত ভারত বিরোধী গোষ্ঠীর প্রচার কিংবা সস্তা ভোটের রাজনীতিতে প্রভাবিত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কংগ্রেসের ভোট বাড়ার পিছনে এই সমস্ত গোষ্ঠীর অবদান অনস্বীকার্য। রাজস্থানে জিগ্নেশ মেওয়ানির মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী দলিত নেতাদের দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় ট্রাইবেল পার্টি ০.৭ শতাংশ ভোট পেয়ে ২টি আসন দখল করলেও সমস্ত রাজ্য জুড়ে ওরা কংগ্রেসের পক্ষে প্রচার চালিয়েছে। মাওবাদীরা সাধারণত ভোট বয়কটের ডাক দিয়ে থাকে। কিন্তু এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে মাওবাদীরা সরাসরি কংগ্রেসের হয়ে ভোট প্রচারে নেমেছিল। এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করতে হলে ছত্তিশগড়ের মাওবাদী গড় বলে পরিচিত এলাকাগুলির ফলাফল দেখতে হবে। যেমন বস্তার অঞ্চলে গত নির্বাচনে বিজেপি চারটি আসন পেয়েছিল এবার পেয়েছে একটি। ছত্তিশগড়ের আরও একটি মাওবাদী এলাকা সরগুজা-যশপুরে ২০১৩ সালে বিজেপি চারটি আসন পেয়েছিল এবার একটিও পায়নি। এই এলাকায় কংগ্রেসের আসন ৭ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৪। বিভিন্ন এনজিওর বিদেশি ফান্ডিং বন্ধ করে দেশের ভিতর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করার ফলে বিজেপি জামানায় এদের ঝাপ বন্ধ হতে বসেছিল। স্বাভাবিক ভাবেই নির্বাচনে বিজেপিকে হারানোর জন্য এরা মরিয়া হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় এই সমস্ত ভারত বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর লক্ষ্য কিন্তু কংগ্রেসকে শক্তিশালী করা নয়। বিজেপি বা কংগ্রেসের নীতি আদর্শের সাথে ওদের কোনও লেনাদেনা নেই। এই মিশনারি- জেহাদি-মাওবাদী গ্যাংয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো কংগ্রেসি জামানাকে ব্যবহার করে ওদের সাংগঠনিক ভিত আরও মজবুত করে নিয়ে ভারতের বুকে আঘাত হানা। নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে কংগ্রেস সরকার কখনোই এদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারবে না। স্বাভাবিক যুক্তিতেই বোঝা যায় যে রাহুল গান্ধীর ক্যারিশ্মা নয়, বিভিন্ন নেতিবাচক বিষয় কেন্দ্রীভূত হওয়াতে এই তিন রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায়। এই বিশ্লেষণের বাস্তবতা ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছে। রাজস্থানে কংগ্রেস সরকার গঠনের ঠিক ১০ দিন বাদে ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে ১৩টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৮টি এবং কংগ্রেস পেয়েছে ৫টি। আলোয়ার জেলা পরিষদ বিজেপির দখলে গিয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা শুধু রাজস্থান নয় মধ্যপ্রদেশে কোনও স্থানীয় নির্বাচন হলে বিজেপি কংগ্রেসের চেয়ে ভালো ফল করবে।

তিন, তেলেঙ্গানা ও মিজোরামে হারলেও হিন্দিবলয়ের তিন রাজ্যে কংগ্রেসের জয়ের রহস্যটা কী? ভোটের ফলাফলের পাটিগণিত বলছে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে বিজেপি কংগ্রেসের কাছে নয় পরাজিত হয়েছে নোটা বোতামের কাছে। ক্ষমতা মানুষকে অহংকারী করে, দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে, মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাছাড়া ক্ষমতাসীন দল বকধার্মিক ধান্ধাবাজদের ভিড়ে ভারাক্রান্ত হতে থাকে। টানা ক্ষমতায় থাকলে দলে ধান্দাবাজ চাটুকারদের প্রাধান্য বেড়ে চলে। ঝাপসা হতে থাকে লক্ষ্যস্থল। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে নোটা ভোটের বিপুল অঙ্ক বলে দিচ্ছে এই রাজ্যগুলিতে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের একাংশ নানা দোষে দুষ্ট হয়ে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ফলস্বরূপ অভিমানী কমিটেড ভোটারা নোটার বোতাম টিপে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এই নোটার ভোটাররাও যে কংগ্রেস মুক্ত ভারতের স্বপ্ন দেখে এই বিষয়ে বোধহয় খুব একটা সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ ক্ষমতাসীন বিজেপির প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে রাজ্যের মসনদে কংগ্রেসকে বসানোর ইচ্ছে থাকলে এই ভোটারা সহজেই তা করতে পারতেন।

মধ্যপ্রদেশে বিজেপির প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ১০৯টি। বিজেপির হাত ছাড়া হওয়া ৫৬টি আসনের মধ্যে অন্তত এক ডজন এমন আসন আছে যেখানে জয় পরাজয়ের মার্জিনের চেয়ে নোটার ভোট বেশি।

মধ্যপ্রদেশে ১৩ জন মন্ত্রী হেরেছে। এর মধ্যে ওজনদার ক্যাবিনেট মন্ত্রীরাও রয়েছেন। এতজন মন্ত্রীর হেরে যাওয়া প্রমাণ করে দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে মসনদে থাকার ফলে ক্ষমতার অহংকারে সরকারের কিছু মানুষজন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। সরকারের কেষ্টাবিষ্টুদের এই জনবিচ্ছিন্নতা হয়তো অতি আত্মবিশ্বাস জনিত কারণে দলের স্ক্যানারে ধরা পড়েনি। আবার এটাও হতে পারে যে এই জনবিচ্ছিন্নরা দলের মধ্যে এতটাই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল যে সমস্ত কিছু জানা সত্ত্বেও দল এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেনি। এরকম পরিস্থিতিতে নিরুপায় কমিটেড ভোটাররা সাধারণত ভোটকেন্দ্রে যান না। যখন নোটা ছিল না সেসময় এই রকম পরিস্থিতিতে অখুশি ভোটাররা বিকল্প হিসেবে অন্য কোনও দলকে ভোট দিতে হবে বলে ভোট কেন্দ্রেই যেতেন না। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই কমে আসতো ভোটদানের শতাংশ। এখন নোটা হওয়াতে এই ধরনের অসন্তুষ্ট কমিটেড ভোটারদের ক্ষোভ প্রকাশের জায়গা তৈরি হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে নোটায় ৫.৪২ লাখ অর্থাৎ ১.৪ শতাংশ ভোট পড়া এই অসন্তোষের বড়ো প্রমাণ।

মধ্যপ্রদেশে বিজেপির খারাপ ফলের আরেকটি বড়ো কারণ মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহানের বেফাঁস কথাবার্তা। কেন্দ্রের এসসি এসটি আইন প্রসঙ্গে এবং বিরোধীদের বিভিন্ন অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে শিবরাজ সিংহ চৌহান হুংকার ছেড়ে একাধিকবার বলেছেন, 'কোঈ মাইকি লাল হ্যাঁয় যো এসসিএসটি সে উনকা সংরক্ষণ কা অধিকার ছিন্ শাকে'। এই ধরনের হুংকার উচ্চবর্ণের ভোটারদের একটা অংশকে বিজেপি বিমুখ করে তুলেছে। মনে রাখতে হবে, সংরক্ষণের একচেটিয়া রাজনীতির বিরুদ্ধে তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ সোচ্চার হতে শুরু করেছে। স্ববর্ণ সমাজ পার্টির সক্রিয়তা এই বক্তব্যের বড়ো প্রমাণ। এই দল মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে সিংহভাগ আসনেই প্রার্থী দিয়েছে। অনেকের মতে শিবরাজ সিংহ চৌহানের ওই 'মাইকি লাল' হুংকারই নাকি সংরক্ষণ বিরোধী এই দলকে অক্সিজেন জুগিয়েছে। এরা ভোট পেয়েছে সামান্য। তবে এই সামান্য ভোটই মধ্যপ্রদেশে 'কাটে কি টক্কর' পরিস্থিতিতে বিজেপির যাত্রা ভঙ্গ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে ক্ষমতায় থাকার ফলে মানুষের মনে পরিবর্তনের স্পৃহা জাগ্রত হবে এটাই স্বাভাবিক। এই মনস্তাত্ত্বিক কারণের জন্য গত বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় ভোট শতাংশের এই হেরফেরকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কখনই বড়ো বিপর্যয় বলে অভিহিত করা যায় না। বিধান সভার এই পরাজয় বিজেপির নেতা কর্মীদের আত্মতুষ্টির ভাব কাটিয়ে

আবার মারমুখী হয়ে সেই লড়াইয়ের ময়দানে ফিরতে সাহায্য করবে। বিজেপির এই লড়াকু ভাবমূর্তি নোটায় ভোট দেওয়া সেই অভিমানী ভোটারদের আবার বিজেপি মুখী করবে এটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দল হিসেবে কংগ্রেসের পক্ষে হয়তো মোদী ম্যাজিক সামলে উঠা সম্ভব নাও হতে পারে।

রাজস্থানে কমপক্ষে ১৫টি আসন আছে যেখানে বিজেপি প্রার্থী যত ভোটে হেরেছে তার চেয়ে বেশি ভোট পড়েছে নোটায়। যেমন মারওয়ার জংশন বিধানসভা আসনে নির্দল প্রার্থী কুওয়ার সিংহ বিজেপির কেশারাম চৌধুরীকে ২৫১ ভোটে পরাজিত করেছে। এই কেন্দ্রে নোটায় পড়েছে ২৭১৯টি ভোট। এরকম ঘটনা এক ডজনেরও বেশি কেন্দ্রে ঘটেছে। মধ্যপ্রদেশের মতো এখানেও নানা করণে অখুশি বিজেপির কমিটেড ভোটাররা যে নোটা বোতাম টিপেছে এ বিষয়ে খুব একটা সন্দেহের অবকাশ নেই। নোটায় যারা ভোট দিয়েছেন তারা বিজেপির কমিটেড ভোটার না হলে কংগ্রেস বা অন্য দলকেও ভোট দিতে পারতেন। মোট ভোটের হিসেবে দেখা যাচ্ছে বিজেপি কংগ্রেসের থেকে ১,৭৭,৬৯৯টি ভোট কম পেয়েছে আর নোটায় পড়েছে ৪,৬৭,৭৮১টি ভোট। পরিসংখ্যান বলছে সামগ্রিক ভাবে বিজেপির জনসমর্থন কংগ্রেসের থেকে অনেকটাই বেশি। এতে প্রমাণ হয় মতাদর্শের জন্য নয় বিজেপি পরাজিত হয়েছে ক্ষমতার অহংকারে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া কিছু নেতা কর্মীর জন্য। ভোটের ময়দানে অবতীর্ণ ৩০ জন মন্ত্রীর মধ্যে ২০ জন মন্ত্রীর পরাজিত হওয়া এই জন বিচ্ছিন্নতার ভাবনাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। রাজস্থানে প্রতি পাঁচ বছর পরপর সরকার পরিবর্তন হয় এটা ওই রাজ্যের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের পরিবর্তনের সাধারণত ক্ষমতাসীন দল ধরাশায়ী হয়ে যায়। কিন্তু সেখানে বিজেপির এই বিপুল জনসমর্থন প্রমাণ করে যে দল পরিচালনায় ভাবাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ নতুন মুখ আনলে আবার ঘুরে দাঁড়ানো কোনও সমস্যা হবে বলে মনে হয় না।

২০১৩ সালে রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল ৪৫.২ শতাংশ ভোট, যা ২০১৮-এর নির্বাচনের তুলনায় ৬.৪ শতাংশ বেশি। ২০১৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল ৩৩.১ শতাংশ ভোট, যা ২০১৮-এর নির্বাচানের তুলনায় ৬.২ শতাংশ কম। ২০১৩ সালে প্রথমবার নোটা চালু হয়। সেবারও নোটায় পড়েছিল ৫৮৯৯২৩টি অর্থাৎ ১.৯ শতাংশ ভোট। এবারের নির্বাচনেও নোটায় পড়েছে ১.৩ শতাংশ ভোট। সাধারণ যুক্তিতে নোটা ভোটারদের ক্ষমতাসীন দলের অসন্তুষ্ট ভোটার ধরে নেওয়া হলেও রাজস্থানের ক্ষেত্রে এই ধরনের ভোটারদের মনস্থিতি জানার জন্য আরও বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন আছে। গত লোকসভা নির্বাচনে রাজস্থানে বিজেপি সবকটি আসন দখল করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। তবে এবার কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার জন্য লড়াইয়ের ময়দান কঠিন হলেও রাজস্থানে বিজেপি কিছু আসন হারালেও খারাপ ফল করবে না এটা বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পরিসংখ্যান এবং সাম্প্রতিককালে পঞ্চায়েতের উপনির্বাচনের ফলাফল থেকে স্পষ্ট। তাছাড়া কিছু ওপিনিয়ন পোলেও এরকম ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যাতে দেখা যাচ্ছে বিধান সভায় কংগ্রেসের পাল্লা ভারি হলেও লোকসভায় জনমতের পাল্লা বিজেপির দিকে ঝুঁকে আছে।

উনিশের নির্বাচনে বিজেপিকে এক অদৃশ্য মহাজোটের সঙ্গে লড়তে হবে। তিন রাজ্যের পরাজয়ে বিজেপি শিবিরে ২০০৪-এর মতো আত্মতুষ্টি জনিত অসতর্কতা না থাকারই সম্ভাবনা। ফলে উনিশের মহারণের আগে এই পরাজয় বিজেপিকে অনেক বেশি সতর্ক করে তুলবে। শাপে বর হয়ে দেখা দিতে পারে এই পরাজয়।

এক জিনিস বার বার দেখতে থাকলে ভালো মন্দের বিচার না করলেও একঘেয়েমি আসে। ছত্তিশগড়ে পরপর তিনবার বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে। ফলে অবিজেপি জামানা কেমন হতে পারে সে অভিজ্ঞতা ছত্তিশগড়ের নবীন প্রজন্মের নেই। মাওবাদী, অজিত যোগী ইত্যাদি ফ্যাক্টর থাকলেও এই পরিবর্তনের স্পৃহাই ছত্তিশগড়ের পালা বদলের মূল কারণ। অসন্তোষ থাকলে তার মোকাবিলার নানা পথ থাকে। কিন্তু এই ধরনের পরিবর্তনের স্পৃহা এমন একটি ফ্যাক্টর যে এটাকে মোকাবিলা করা বোধহয় অসম্ভব ব্যাপার। লোকসভায় অবশ্য এই ধরনের বিষয় নেই তাছাড়া বিজেপি বিরোধী তেমন কোনও অসন্তোষের ব্যাপারও নেই। এতদিন ক্ষমতার কোমল স্পর্শে থাকা বিজেপি কর্মীরা রাজ্যপাট হারিয়ে এখন কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন। ফলে লোকসভায় বিজেপি আগের মতোই ভালো ফল করবে এমন ভাবনা অনেক বিশ্লেষকের কলমেই ধরা পড়ছে।

তিন রাজ্যের বিজেপির পরাজয় বিরোধী শিবিরকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। প্রায় সমস্ত আঞ্চলিক দলই কংগ্রেসের ছোঁয়া এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। মমতা, মায়াবতী, অখিলেশ যাদব, চন্দ্রবাবু নাইডু এরা সবাই কেন্দ্রে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকায়। আবার অনেকে প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হচ্ছে। এটা ওদের করতেই হবে না হলে মানুষ ভোট দেবে কেন? গত লোকসভার ফলাফলের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে বিরোধীদের বিশেষ করে কংগ্রেস দলের উৎসাহিত হওয়ার তেমন কিছু নেই। রাহুল গান্ধীকে মিডিয়া যতই তুলে ধরার চেষ্টা করুক না কেন মানুষ যে এতে প্রভাবিত হচ্ছে না পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফলেই তার প্রমাণ। কেন্দ্রে সার্কাস মার্কা জোট সরকার তৈরি হয়ে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হোক এটা কেউ চায় না। বিভিন্ন জনমত সমীক্ষা বলছে ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি আশাতীত ভালো ফল করতে চলেছে। হিন্দি বলয়ে কিছু আসন হারালেও এই দুই রাজ্য থেকে সেই ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে। পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট যে পরস্পর বিবদমান ভারত বিরোধী মাওবাদী মিশনারি জেহাদি গোষ্ঠীগুলি বিজেপিকে পরাজিত করতে দলিত মুসসলমান বা খ্রিস্টান স্বার্থরক্ষার নামে যে অঞ্চলে যে বিরোধী শক্তি বিজেপিকে টক্কর দিতে সক্ষম তাদের হয়ে হুইপ জারি করছে, টাকা পয়সা ছড়াচ্ছে। এক কথায় উনিশের নির্বাচনে বিজেপিকে এক অদৃশ্য মহাজোটের সঙ্গে লড়তে হবে। তিন রাজ্যের পরাজয়ে বিজেপি শিবিরে ২০০৪-এর মতো আত্মতুষ্টি জনিত অসতর্কতা না থাকারই সম্ভাবনা। ফলে উনিশের মহারণের আগে এই পরাজয় বিজেপিকে অনেক বেশি সতর্ক করে তুলবে। শাপে বর হয়ে দেখা দিতে পারে এই পরাজয়।

মমতা জানেন হাটে হাঁড়ি ভাঙার ক্ষমতা রাখেন সুমন

চন্দ্রভানু ঘোষাল

সুমনের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকদিন পর নাটক আবার জমে উঠেছে। গল্পে একটা মোক্ষম টুইস্টের যে অভাব ছিল তা পূরণ করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন পরিচিত কোনও সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলেই, তিনি 'শুনেছ...' বলে শুরু করে দিচ্ছেন। এবং যেটি শোনা যাচ্ছে সেটি মোটামুটি এইরকম : চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার দায়ে সিবিআই আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন এবং এই সময় পত্রিকার সদ্য প্রাক্তন সম্পাদক সুমন চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে কেউ একজন প্রতিটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় দপ্তরে ফোন করেন। না, বড়ো কোনও দাবি তিনি করেননি। শুধু বলেছিলেন, খবরের কাগজে খবর তো বেরোবেই। কিন্তু সুমনের গ্রেপ্তার হওয়ার খবর নিয়ে কোনওরকম বাড়াবাড়ি যেন না করা হয়। এই ঘটনার সত্যি মিথ্যে যাচাই করার সুযোগ আমাদের নেই। সুমন চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর ঠিক যা শোনা গেছে তাই লিপিবদ্ধ করা হলো।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে ঘটনাটা কি নেহাতই অবাস্তব? অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বিশ্বস্ত কাউকে দিয়ে এরকম অনুরোধ করতে পারেন না? গত দুই দশকের বঙ্গীয় রাজনীতি পর্যালোচনা করলে বলতে হয়, নিশ্চয়ই পারেন। মমতার সঙ্গে সুমনের 'সুসম্পর্ক' তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকে। ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট জেতার পর আনন্দবাজার পত্রিকা তার চিরাচরিত কংগ্রেসি ঘরানা থেকে বেরিয়ে এসে তৃণমূলের ঢালাও প্রচার শুরু করেছিল। উদ্দেশ্য মোটামুটি দুটো। ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বরুণ সেনগুপ্তের বর্তমান পত্রিকার জ্যোতি বসু-বিরোধী ভাবমূর্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া এবং প্রধান বিরোধী দলনেত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জনসমক্ষে তুলে ধরা। কংগ্রেসের অন্তর্জলি যাত্রা ২০০১-এর অনেক আগেই শুরু হয়ে দিয়েছিল। নেতারা 'তরমুজ' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিতও হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং গান্ধী পরিবারের কাসুন্দি গেয়ে যে আর বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যাবে না সেটা বুঝতে ওই পত্রিকাগোষ্ঠীর মালিকদের অসুবিধে হয়নি। একটা ভোলবদল প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সুমন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সেই ভোলবদলের কাণ্ডারি। বস্তুত যতদিন (২০০৪ পর্যন্ত) ওই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ততদিন তিনি এবং তার স্তাবক সাংবাদিককুল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন। অবস্থা এমনই দাঁড়ায় যে সেইসময় রাজ্য রাজনীতির যে কোনও বিতর্ক শেষ হতো একটি সাধারণ মীমাংসায়। ২০০৬ সালের নির্বাচনে মমতা অবশ্যই জিতবেন। কেউ তাকে হারাতে পারবে না। মানুষ অবশ্য এই কাণ্ডজে মীমাংসা গ্রহণ করেননি। ফল হয়েছিল উলটো। বিপুল ব্যবধানে জিতেছিল বামফ্রন্ট। জন্ম হয়েছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিখ্যাত 'আমরা-ওরা' তত্ত্বের। কিন্তু একটা কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, সুমন চট্টোপাধ্যায় এবং তার পূর্বতন সংবাদপত্রের সহৃদয় সাহচর্য না পেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে আজকের অবস্থানে পৌঁছতে পারতেন না। এবং সেটা মমতাও জানেন।

সংবাদপত্র যতদিন শিল্প হয়নি ততদিন গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে এর মান ও মর্যাদা দুইই অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু শিল্প হবার পর সাংবাদিকতা পেশাটির মারাত্মক অবনমন ঘটেছে। এর জন্য ক্ষমতার আঁচে গা-সেঁকা এক শ্রেণীর সংবাদপত্র মালিক এবং সুমন চট্টোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষেদের মতো ধান্দাবাজ সাংবাদিকরাই দায়ী।

যাইহোক, ২০০৬ সালে যা হয়নি, ২০১১ সালে তাই সুসম্পন্ন হলো। অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হলেন। কিন্তু দু' বছর যেতে না যেতেই ২০১৩ সালে জড়িয়ে পড়লেন সারদা কেলেঙ্কারিতে। তারপর একে একে প্রকাশ্যে এল রোজভ্যালি, চক্র ও আইকোর চিটফান্ড কেলেঙ্কারি। নারদ স্টিং অপারেশন আমাদের দেখিয়ে দিল তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নেন। এর মধ্যে শুধু নারদ কাণ্ডে সুমন ছিলেন না। প্রত্যেকটি

চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে উঠে এসেছে তার নাম। সাধারণ মানুষের কোটি কোটি টাকা তিনি আত্মসাৎ করেছেন। এত বড়ো পুকুরচুরি প্রশাসনের নজর এড়িয়ে করা সম্ভব নয়। প্রশাসনের মাথারা বখরা পেতেন বলেই সুমন চট্টোপাধ্যায়ের মতো মারাত্মক অপরাধী এতদিন ধরা পড়েননি। সুতরাং মমতা সুমনের সবই জানেন। কিন্তু এর উলটোটাও তো একইরকম সত্যি। সুমনও কি মমতার অনেক কিছু জানেন না? সেটাই তো স্বাভাবিক। ঠিক যেমনটি সংবাদ প্রতিদিনের প্রাক্তন সাংবাদিক কুণাল ঘোষও জানতেন। মাঝে মাঝে সব ফাঁস করে দেবার হুমকিও দিতেন। মমতা গ্রাহ্য করেননি। কিন্তু তিনি একটা কথা বিলক্ষণ জানেন, কুণালের সঙ্গে সুমনকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। সুমন চট্টোপাধ্যায় অন্য ধাতুতে গড়া। উদ্ধত বেপরোয়া এবং স্বভাবত অপরাধপ্রবণ এই সাংবাদিকের ল্যাজে পা পড়লে তিনিও পাল্টা দেবেন। তাতে বিপদে পড়বেন মমতা। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে তিনি কোনও ঝুঁকি নেবেন না। এ হেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ যেখানে বর্তমান, সেখানে সুমনের গ্রেপ্তার হবার খবর রয়েসয়ে পরিবেশন করার কথা মমতা বলতেই পারেন। এই জন্যেও সম্ভবত কলকাতার বাঙ্গালি সাংবাদিকেরা সুমন প্রসঙ্গ দায়সারা ভাবে প্রকাশ করেছেন। সুমন যে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তারা তো খবরটা প্রকাশই করেনি। শুধু প্রিন্টার্স লাইনে সম্পাদকের নাম বদলে দিয়েছে।

আমাদের দেশে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই। ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, এই তালিকায় ওপরের দিকে নাম রয়েছে দেশের জাতীয় এবং আঞ্চলিক স্তরের কয়েকটি মিডিয়া হাউজের। বাংলা মিডিয়ার নামও রয়েছে তালিকায়। চিটফান্ড সংস্থাগুলির সঙ্গে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের যোগসাজশ এবং কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের চালচিত্রটি বিশ্লেষণ করলেই বিষয়টির গুরুত্ব বোঝা যাবে।

অনুকূল মাইতির মালিকানাধীন আইকোর একটি চিটফান্ড সংস্থা। অন্যান্য চিটফান্ড সংস্থার মতো এই সংস্থাও সংবাদপত্র ব্যবসায় আসে এবং 'একদিন' নামের একটি সংবাদপত্রের মালিকানা কিনে নেয়। তখন সুমন ছিলেন সম্পাদক। আইকোরের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমে সিবিআই যেসব নথিপত্র উদ্ধার করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, আইকোর দিশা প্রোডাকশনস অ্যান্ড মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থা এবং তার ডিরেক্টরের নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা হস্তান্তর করেছে। দিশা প্রোডাকশনস অ্যান্ড মিডিয়া পাইভেট লিমিটেডের মালিক এবং ডিরেক্টর সুমন চট্টোপাধ্যায়। এই তথ্যের সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশে সিবিআই একাধিকবার সুমনকে তলব করেছিল। সুমন যাননি। নানা অজুহাতে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু সিবিআই ক্রমশ চাপ বাড়াচ্ছিল। শেষে বিপদ বাড়ছে দেখে সুমন দেশ ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। সিবিআই কর্তারা আগেভাগে ব্যাপারটা আন্দাজ করে সুমনের নামে ইয়েলো-কর্ণার নোটিস জারি করেন। এই ধরনের কোনও নোটিশ জারির কথা সুমন জানতেন না। একবার কারও নামে ইয়েলো কর্ণার নোটিশ জারি হলে দেশ ছেড়ে কোথাও যাওয়া যায় না। বিমানবন্দরে গেলেই সেখানকার অফিসাররা নোটিশ জারি করা এজেন্সির কর্তৃপক্ষকে খবর দেন। যাই হোক, সুমন ভিয়েনায় পালাবার জন্য দিল্লি বিমানবন্দরে যান এবং ধরা পড়েন। সিবিআই অফিসাররা তাকে জানিয়ে দেন তিনি দেশ ছেড়ে যেতে পারবেন না। তার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এই ঘটনার পর সিবিআই আবার তাকে তলব করে। কিন্তু আবারও অসহযোগিতা করেন সুমন। সিবিআই কর্তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। এরপর তারা যে নোটিশ পাঠালেন তার ভাষা এবং ভঙ্গী দুইই আলাদা। সুমন চট্টোপাধ্যায় এলেন। প্রথম দিকে ঔদ্ধত্যভরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেলেও, টানা জেরায় ভেঙে পড়লেন এক সময়। অনুকূল মাইতির কাছ থেকে বিপুল অর্থ নেওয়ার কথা স্বীকার করলেন। বস্তুত সিবিআই সুমনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই তাকে গ্রেপ্তার করেছে। তদন্তকারী অফিসারেরা জানিয়েছেন, শুধু আইকোর নয়, নিজেকে প্রভাবশালী বলে পরিচয় দিয়ে সুমন সারদা, রোজভ্যালি এবং চক্র গ্রুপ থেকেও কোটি কোটি টাকা হাতিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হলো, সিবিআই কি সুমনের 'অপরাধ' আদালতে প্রমাণ করতে পারবে? নাকি অন্য অনেকের মতো সুমনও জামিন পেয়ে হাসতে হাসতে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবেন? আইন বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এক্ষেত্রে সুমনের ক্রমাগত নিজেকে প্রভাবশালী হিসেবে জাহির করার প্রয়াস তার জামিন পাওয়ার অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে। আর সুমন জামিন না পেলে কী হতে পারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব ভালো করেই জানেন। বিশেষ করে যেখানে আর কিছুদিনের মধ্যেই নারদ স্টিং অপারেশনের ভিডিওটি জাল কি আসল, তার প্রমাণ সিবিআই আদালতে দাখিল করতে চলেছে। সুতরাং মমতা খুব একটা স্বস্তিতে নেই। সারদাকাণ্ডে সিবিআই কাউকে গ্রেপ্তার করলে সাধারণত তিনি তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্র খুঁজে পান। এবার পাননি।

এক প্রবীণ সাংবাদিকের মুখে শুনেছি, সংবাদপত্র যতদিন শিল্প হয়নি ততদিন গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে এর মান ও মর্যাদা দুইই অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু শিল্প হবার পর সাংবাদিকতা পেশাটির মারাত্মক অবনমন ঘটেছে। এর জন্য ক্ষমতার আঁচে গা-সেঁকা এক শ্রেণীর সংবাদপত্র মালিক এবং সুমন চট্টোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষেদের মতো ধান্দাবাজ সাংবাদিকরাই দায়ী। এখন সাধারণ মানুষ সাংবাদিকতার প্রসঙ্গ উঠলেই সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। অর্থ এবং ক্ষমতার কাছে বিকিয়ে যাওয়া মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সিবিআইয়ের হাতে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তার হওয়া একটি ইতিবাচক ঘটনা। অন্তত এইটুকু জানা গেল ধর্মের কল সত্যিই একদিন বাতাসে নড়ে। তিনি নেতা হোন, নেত্রী হোন, মাফিয়া সংবাদপত্রের ধুরন্ধর সম্পাদক হোন— মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে বেশিদিন পার পাবেন না। পশ্চিমবঙ্গের ঘোর দুঃসময়ে এই বিশ্বাস ফেরত পাওয়াও বড়ো কম কথা নয়। ▮

মোদীর অর্থনীতি

‘অচ্ছে দিন’ তাড়াহুড়োয় আসে না, ধৈর্য ধরতে হয়

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

‘অচ্ছে দিন’ এই পদবন্ধটির তাৎপর্য এক একজনের কাছে একেক রকম। এর বহু অর্থ হতে পারে। কিন্তু ভোটদাতা জনগণের কাছে এর দুটো সরল মানে আছে, চাকরি আর আয় বাড়া। চাষিরা এটাকে বোঝে একরকম ভাবে যেমন উৎপন্ন ফসলের বাড়তি দাম আর ভরতুকিযুক্ত চাষের উপকরণ সার, কীটনাশক, কম দামে ডিজেল ইত্যাদি। এর বিপরীতে আছে অকৃষিজ শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা আশা করে আরও চাকরির সুযোগ পাওয়া যাবে এবং নতুন ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোগের জন্য লাল ফিতের ফাঁস আলগা হবে।

একটা কথা এখানে বলা দরকার, ভারতের মোট জিডিপির মাত্র ১৫ শতাংশ কৃষিজ পণ্য থেকে আসে। অথচ এই কৃষক শ্রেণীই কিন্তু এর তিনগুণ আয়তনের জনগণের খাদ্যের জোগান দেয়। সুতরাং গ্রামীণ ও শহুরে আকাঙ্ক্ষা যে বিন্দুতে এসে মেলে, তা হলো কাজ বা চাকরি। যদি নরেন্দ্র মোদীর সরকারের পাঁচ বছর মেয়াদের শেষে ভারতের হিন্দি বলয়ের তিনটি রাজ্য তার বিরুদ্ধে ভোট দেয়, ব্যবধান যতই ক্ষীণ হোক বা নোটা ভোটের মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারিত হোক না কেন, বিজেপির ভোটব্যাঙ্কে যে ধাক্কা লেগেছে ওই তিন রাজ্যে তাতে সন্দেহ নেই। তবে আন্টি-ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর অবশ্যই আছে। এটাও ধরে নেওয়া যায় যে চাকরি ও আয় জোগানের ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি আছে। শহর ও গ্রাম দুই জায়গাতেই বিজেপির ভোট কমেছে। এর অর্থ এই নয় যে, কোনও চাকরি তৈরি হচ্ছে না। সুইগি, আমাজন, ওলা, উবের, ডমিনোজ ও অন্য কোম্পানিগুলো শুধু খাবার সরবরাহ করে না, চাকরির সংস্থানও করে।

কিন্তু এটা শুধু চাকরির সমস্যা নয়। মানুষের ঊর্ধ্বমুখী আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে অর্থনীতির যতটা সংস্কার হওয়া দরকার ছিল তা হয়নি। ফলে প্রত্যাশা পূরণে ঘাটতি থেকে গেছে। চরম দারিদ্র্যের পরিমাণ কমেছে তাই আজকের তরুণ প্রজন্ম অল্প বেতনে সন্তুষ্ট হয় না, তারা আরও ভালো সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে পারে। ভারতীয় অর্থনৈতিক তদারকি কেন্দ্র সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে যে, ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৮ সালের আগস্ট— এই সময়কালে ভারতের যারা চাকরিরত এবং যারা চাকরি খুঁজছে তাদের সংখ্যা কমেছে ৪.২ শতাংশ। এর অর্থ হতে পারে লোকে আরও বেশি লেখাপড়া শিখছে। আজিম প্রেমজী বিশ্ববিদ্যালয় জানাচ্ছে যে, এই রকম খোলা বেকারত্বের হার মোটের উপরে ৫ শতাংশ আর তরুণ উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে ১৬ শতাংশ।

কেন এই চাকরি তথা বেতন সমস্যার উদ্ভব হলো? তার একটা কারণ এই যে মোদীর অর্থনীতি সংস্কারের নয়। যা ইতিমধ্যে আছে তিনি তার মাধ্যমে অগ্রসর হতে চান। যেসব কর্মসূচি যোগ্য বিবেচনা করেছেন মোদী তাদের ত্বরান্বিত করতে চেয়েছেন। ভারতীয় অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক রূপান্তর আনতে যে সংস্কার কর্মসূচি দরকার ছিল তাতে রাজনৈতিক সমস্যা ছিল। তাই তিনি সমাধান করতে চেয়েছেন উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে। তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে কর্মসূচি রূপায়ণের মাত্রা ও গতি বাড়ানো। মৌলিক নীতিসমূহের পুনর্মূল্যায়ন নয়। যেমন তিনি চেয়েছিলেন পূর্বতন সরকার যেখানে ছেড়েছিলেন সেইখান থেকে গতি ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আধার ও প্রত্যক্ষ নগদ জমা ইউপিএ-র আমলে শুরু হতে পারে কিন্তু তার রূপায়ণ ছিল একেবারে নগণ্য। মোদী তাকে সর্বত্রগামী করেছেন। ইউপিএ জমানায় যে টুজি ও কয়লাখনি বণ্টন ঘোটালা হয়েছিল তার ফলেই স্পেকট্রাম ও কয়লা খনি নিলামের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের নিজস্ব উদ্ভাবিত ‘শূন্য ক্ষতির তত্ত্ব’ ফাঁস হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে রাজস্ব আদায়ের বৃদ্ধি ঘোষণা করতে ভয় পেয়েছিল। তারা বলেছিল যে, যেহেতু এই দুই ক্ষেত্রে কোনো আপাত ক্ষতি হয়নি তাই এটাকে ঘোটালা বলা যায় না, কিন্তু তাদের

দাম কমেছে	২০১৪	২০১৮
মসুর, মলকা, অড়হর ডাল	১৪০/-১৬০/-	৭০/-৬০/-
আটা	৩০/-	২৩/-
ব্যসন	১৪০/-	৮০/-
উন্নতির কিছু সূচক		
ইজ অব ডুইং বিজনেস	১৪২	৭৭
গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স	৭৬	৫৭
ই-গভর্নমেন্ট বিজনেস	১১৮	৯৬
ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ইনডেক্স	৪০	১৫
উন্নয়নমূলক কিছু কাজ		
অপ্টিকাল ফাইবার নেট রিচ	৫৯ পঞ্চায়েত	৯০৯৯৬ পঞ্চায়েত
রাস্তা নির্মাণ	৮১০৯৫ কিমি	১২০২৩৩ কিমি
গ্রামীণ বিদ্যুৎ	১১৯৭ মে:ও:	৬০১৫ মে: ও:
ন্যাশনাল হাইওয়ে	৩৬২০ কিমি	১৫৯৪৮ কিমি
নতুন রেল লাইন	৩৬০ কিমি	৯৫৩ কিমি
গৃহনির্মাণ	১৫২০৯ কোটি টা:	১৫৩৪৯৪ কোটি টা:
সৌর বিদ্যুৎ	২৬২১ মে:ও: (১৯৪৭-২০১৪)	৯৬৫২ মে:ও: তিন বছরে

আমলেই প্রমাণ হয়েছিল যে ক্ষতি হয়েছিল।

গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স এবং ইনসলেভন্সি ও ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড আগেও ভাবা হয়েছিল, কিন্তু মোদীই তাকে কার্যকর করেছিলেন অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়েই। তাঁর মূল বিষয় ছিল ভ্রষ্টাচার ও কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াই, কর দিতে সবাইকে বাধ্য করা, ঋণ খেলাপীদের শাস্তি প্রদান করা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আরও বেশি করে বিধিবদ্ধ করা। এর ফলে চাকরি ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ে, একে অর্থনীতির ভাষায় ডিফ্লেশন বলা হয়। মোদীর গৃহীত ব্যবস্থায় তাৎক্ষণিক ফল এই হয়েছিল যে তিনটে অসংস্কৃত ক্ষেত্রে ডিফ্লেশন ঘটেছিল, সরকারি ব্যাঙ্ক, জমি ও শ্রমজীবী মানুষ এবং কৃষি অর্থনীতি যেখানে সরকারি হস্তক্ষেপ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকে। যখন নগদ জোগান সংকুচিত হয় এবং করক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয় টাকা ব্যক্তির হাত থেকে সরকারের হাতে চলে যায়। তাতে স্বল্পমেয়াদি উপভোগ ও বিনিয়োগের দাবি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জিএসটি জাল ছড়ালে অনেক অনথিভুক্ত ফার্ম নথিভুক্ত হয়, এর ফলে ফার্মগুলোর করবাবদ ও মজুরি বাবদ খরচ বাড়ে। যখন অধিকতর সংখ্যায় কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রকল্প ও সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনা হয় স্বল্প মেয়াদে কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব পড়ে। কারণ কর্মচারীদের জন্য খরচ বাড়ে আর নিয়োগকারী সংস্থা কম সংখ্যায় কর্মী নিয়োগ করে। কিন্তু এই সব কারণে ফার্মগুলোর বিধিবদ্ধকরণ, অধিকতর কর প্রদান বা কীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ বেসরকারি সংস্থার কাছে বিক্রি করা হবে সে ব্যাপারে স্বচ্ছতা আনয়ন করার বিরুদ্ধে কথা বলা যায় না। অর্থনীতিতে এর সুফল ফলতে দীর্ঘ সময় লাগে। স্বল্প মেয়াদে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভাঁটা পড়ে অন্তত যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয় না। এবং এতে চাকরি ও আয়ে প্রভাব পড়ে।

মোদী জমানার সাফল্যের খতিয়ান : ১৯৪৭-২০১৪ গ্যাস কনেকশন-৫৫ শতাংশ, ২০১৪-২০১৮-৯০ শতাংশ, চার বছর মোদী ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক থেকে এক পয়সাও ঋণ করেননি। চার বছর আগে চীন কথায় কথায় চোখ রাঙাত এখন তাদের নিজের ভাষায় তারা জবাব পাচ্ছে। ইরানের সাড়ে ছেচল্লিশ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ শোধ করছেন মোদী। মনমোহনের আমলে অর্থব্যবস্থা ৩৫তম স্থানে পৌঁছেছিল আর এখন ষষ্ঠ। ট্যাক্সদাতার সংখ্যা ৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২.২৬ লক্ষ ভুয়ো কোম্পানি বাতিল হয়েছে। সাড়ে তিন হাজার কোম্পানির বেনামি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

অচ্ছে দিন আসবে কিন্তু মোদীর প্রথম পাঁচ বছরে নয়, যদি তিনি পুনর্নির্বাচিত হয়ে আসেন তবেই তিনি এর লাভের ফসল ঘরে তুলতে পারেন। নচেৎ পরবর্তী অন্য সরকার এর কৃতিত্বের ঝোল নিজের কোলে টানবে, ঠিক যেমন বাজপেয়ীর সংস্কারের সুফল ইউপিএ সরকার নিজের বলে চালিয়েছিল। মোদী বিরোধী যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন তারা মোদীর কৃতিত্ব আত্মসাৎ করবে ও জনমোহিনী পদক্ষেপ নিয়ে আবার দ্বিতীয় ইউপিএ জমানার মতো ঘোটালা ও নীতি-পঙ্গুত্বের দিকে দেশকে ঠেলে দেবে, ধর্মীয় ও সামাজিক সর্বনাশের কথা না হয় নাই বললাম। সিসকোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান জন চেম্বার্স বলেছেন, মোদীকে যদি তাঁর লক্ষ্য পূরণের সুযোগ না দেওয়া হয় তাহলে সাংঘাতিক ভুল হবে।■

ঋণ খেলাপীদের শায়েস্তা করতে বদ্ধপরিকর কেন্দ্র

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশের লোকসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসবে ততই সরকার তার কার্যকালে কী ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করেছে তার প্রচার করবে। সরকারের বহুবিধ জনহিতকর প্রকল্প চালু করা ও দেশের অর্থনীতির স্বাস্থ্যোদ্ধারে তার ভূমিকার সূত্রে একটি যুগান্তকারী আইন প্রণয়নের প্রসঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন।

রাজনীতিকরা চরিত্রানুগভাবে জনহিতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। অর্থনৈতিক জনকল্যাণের শেষ পয়সাটি কিন্তু বোরোয় ব্যাঙ্কিং প্রণালী দিয়ে। উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে যে, কৃষিঋণ মকুবের ধোঁকা দিয়ে যে রাজনৈতিক ওলট পালট হলো সেখানেও কিন্তু মহাজনের কাছ থেকে নেওয়া কৃষি ঋণের বিরাট অংশ কোনও সরকার শোধ করবে না। যদি শেষাবধি আদৌ শোধ হয় তা হবে চাষির ব্যাঙ্ক ঋণ। অতীত তথ্য অনুযায়ী এই প্রতিশ্রুত টাকার বড়ো অংশই ব্যাঙ্কে ফেরেনি বা দীর্ঘদিন বকেয়া থেকে গেছে। ব্যাঙ্কে ঋণ ফেরত না আসায় টাকার জোগান কমে গেছে। বিধ্বস্ত হয়েছে ঋণচক্র। এই ঋণখেলাপের সহজ পন্থা ধরেই বিগত জমানায় দেওয়া বিপুল শিল্প ঋণ ২০১৮ সালের অর্থবর্ষে বকেয়া পড়েছে। ২০১৫ সালের মার্চ অবধি খারাপ ঋণ (এন পি এ) ছিল ৩.২৩ লক্ষ কোটি টাকা যা মার্চ ১৮-তে এসে দাঁড়িয়েছে ১০.৩৫ লক্ষ কোটি টাকার বিপদসীমায়। মনে হবে এগুলি তো এই সরকারের কার্যকালে। তা কিন্তু আদৌ নয়। বিগত সরকারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিপুল ঋণ (স্বাধীনতার পর ৭০ বছরের দেওয়া পরিমাণ থেকে ২০০৪-২০১৪ এর দশ বছরে ছাড়িয়ে যায়)। এই সম্পদ-বন্ধকহীন (প্রধানত) প্রবল ঝুঁকিপূর্ণ ঋণগুলিতেই পচন ধরেছে। ব্যাঙ্কগুলির সুদ বাবদ আদায় ঋণখেলাপের কারণে কমে যাওয়ায় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সম্মিলিত ক্ষতি ১৭/১৮ সালে ৮৭ হাজার কোটি টাকা ছুঁয়েছে। সরকারের তরফে বাড়তি টাকা দিয়ে এই অবস্থা সামাল দেওয়া যাবে

ঋণ খেলাপী বিজয় মাল্য

না। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ২০১৬ সালে অর্থনীতিকে বাঁচাতে NCLT ও NCLAT (National Company Law Tribunal ও appealate tribunal) আইন নিয়ে আসে। এই আইনে ব্যাঙ্কের বড়ো বড়ো ঋণখেলাপী শিল্প সংস্থা বা গ্রুপকে পরিচালন পর্ষদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার নিদান আছে। কোম্পানি পরিচালনায় তাদের কোনও হাত থাকবে না। কোম্পানির সম্পদ ও দায় নিতে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠিত অন্য যে কোনও সংস্থা রুগ্ন কোম্পানি অধিগ্রহণে অংশ নিতে পারে। তবে আবশ্যিক শর্ত হবে ব্যাঙ্ক ঋণ মেটানো। এই সূত্রেই সরকার উল্লেখিত খেলাপী সংস্থাগুলিকে দেউলে ঘোষণা করার ক্ষমতাধারী Insolvencey & Bankruptcy code (IBC) আইনটিও প্রচলন করে। এই যুগ্ম আইনের ফলায় সরকার এই চলে যাওয়া বছরে অবিশ্বাস্য ৮০ হাজার কোটি টাকা অনাদায়ী ঋণ পুনরুদ্ধার করেছে। আইন বলবৎ হওয়া থেকে অর্থাৎ এই দু' বছরে effective dete (Dec 2016) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পুনরুদ্ধার করেছে ৩ লক্ষ কোটি টাকার আদতে অপহৃত ঋণ। এ কথা জানিয়েছেন কোম্পানি সংক্রান্ত দপ্তরের সচিব ইনজেটি শ্রীনিবাস। অন্যদিকে ভারত জুড়ে ১১টি ট্রাইব্যুনাল এই সংক্রান্ত মামলার ২৭০ দিনের মধ্যে দ্রুত নিষ্পত্তি করেছে। যুগান্ত কেটে যাওয়া সাধারণ মামলার সুবিধে নিয়ে অসাধু কোম্পানিগুলির পরিচালন পর্ষদে বসে দেশের অর্থ ধ্বংসের দিন শেষ। চলতি বছরে ভূষণ স্টিল, বিনানী সিমেন্ট, ইলেকট্রোস্টিল-এর ঋণখেলাপী ম্যানেজমেন্টকে হটিয়ে দিয়ে সংস্থার দখল নিয়েছে প্রখ্যাত টাটা স্টিল, বেদান্ত গ্রুপ ও আদিত্য বিড়লার পরিচালনাধীন আলট্রাটেক সংস্থা।

সরকারের এই 'পাশুপত' অস্ত্রের বলে এন সি এল টি-র হাতে এখন ১০ হাজার মামলা এসে পড়েছে। এর মধ্যে ২০১৯ সালে এসার স্টিল, ভিডিওকন, সনেট ইস্পাত, ভূষণ পাওয়ার, অ্যামটেক আলো, রুচি সোয়া বা জেপি ইনফ্রাটেকের মতো দিগ্‌গজ সব (শুধু এসার ৮০ হাজার ও ভূষণ ৪৫ হাজার কোটি) ঋণখেলাপীরা রয়েছেন। অন্যদিকে এদের অধিগ্রহণের জন্য আবেদন জানিয়েছেন (অর্থাৎ নিলামে অংশ নিতে) টাটা স্টিল, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, আলট্রাটেক, ডালমিয়া ভারত বা ইংল্যান্ডের লিবার্টি গ্রুপের মতো স্বনামধন্য সব সংস্থারা। এন সি এল টি-র পেশাদাররা আন্দাজ করছেন বছর শুরুতেই ১ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্কে ঢুকবে।

তবে, হাতে কলমে কাজ করা Resolution proffesional-রা (যারা প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করেন) জানাচ্ছেন খেলাপী কোম্পানিগুলি কাগজপত্র নিয়ে গড়িমসি করায় অনেক ক্ষেত্রে সময় সীমার মধ্যে কাজ শেষ করা যাচ্ছে না। সরকার অবশ্য তৎপর হয়ে ট্রাইব্যুনাল খোলা বিচারকের নিয়োগ ও বাড়তি বেঞ্চ খুলে ক্রমবর্ধিত মামলাগুলির নিষ্পত্তি করতে বদ্ধপরিকর। বিশেষ পেশাদারি বুদ্ধি অধিগত না থাকলেও বলা যায় জনতার যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা প্রায় জলে চলে গিয়ে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রবাহ নষ্ট করে দিয়েছিল, সরকার তা ফিরিয়ে আনতে সাফল্য দেখিয়েছে। দায়বদ্ধতাহীন ঋণ মকুব করে অর্থনীতিকে পঙ্গু করা নয়, ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতির পুঞ্জীভূত জঞ্জাল সাফ করে রক্ত সঞ্চালনের এই অভূতপূর্ব কল্যাণকর সংস্থার বিদেশে অর্থনীতিবিদদের দ্বারা প্রভূত সমাদৃত হয়েছে। ■

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার

দেবব্রত চৌধুরী

উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার রামকোট অঞ্চলে রামজন্মভূমি ছিল— এ কথা প্রচার হলো কীভাবে? সবার ধারণা ভারতের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এই প্রচার করেছে, যা কিন্তু আদৌ সত্য নয়। এক প্রসিদ্ধ ডাচ গবেষক যিনি ভারতের মন্দির-মসজিদ নির্মাণ কৌশল এবং কোন পাথর ব্যবহার হতো তার গবেষণা কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর নাম Hons Baker, তিনি ১৮৫৪ সালে তিনি অযোধ্যার রামকোট পরিদর্শন কালে বাবরি ধাঁচায় ব্যবহৃত পাথর পরীক্ষা করেছিলেন। পরিদর্শন করে রিপোর্টে তিনি লিখেছিলেন, 'মসজিদে ব্যবহৃত পাথর দেখে আমি নিশ্চিন্ত যে এ জাতীয় পাথর কখনও কোনও মসজিদে আমি দেখিনি। এ জাতীয় কালো পাথর স্থাপন পদ্ধতি সাধারণত পুরানো হিন্দু মন্দিরেই দেখেছি— এ জাতীয় কালো পাথর দিয়ে হিন্দুরা বিষ্ণু, শিবের মন্দির তৈরি করে। আমার মনে হয়, মুসলমানরা যখন এই দেশ অধিকার করে, তখন তারা এই বড়ো মন্দিরটির কিছুটা পাল্টে মসজিদে রূপান্তরিত করে।' হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত রামচন্দ্র অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। অতএব এই মসজিদটি রামচন্দ্রের জন্মভূমি হিসাবেই স্থানীয়দের বিশ্বাস। ১৫২৮ সালে মুসলমান গুরু সফি জালাল শাহ মির বাকিকে মুঘল নবাব বাবরের ভারত জয়কে স্মরণীয় করার জন্য রামকোটের বিখ্যাত ওই হিন্দু মন্দিরটি যা রামজন্মভূমি বলে খ্যাত, তা ধ্বংস করে বাবরের নামে রূপান্তরিত করে বাবরি মসজিদ বলে প্রচার করতে নির্দেশ দেয়। মির বাকি গুরুর আদেশ যথাযথ ভাবে পালন করে। ১৮৫৭ সালে পর হিন্দু সৈন্যরা রামচন্দ্রের জয়ধ্বনি দিয়ে রামজন্মভূমিতে অবস্থিত মন্দিরটি পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। মন্দির গড়ার জন্য তখন হিন্দুরা তখন ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রচুর আবেদন করে। ১৮৫৭ সালের পর ভারত পুরোপুরি ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার হাতে আসে। তিনি হিন্দুদের এই আন্দোলনের সঠিক বিচার ব্যবস্থার জন্য আদালতকে আদেশ করেন। ব্রিটিশ বিচারপতি Col. FEA Chamier ১৮৮৫ সালে তার রায়ে বলেন, "It is most unfortunate that a Masjid have been built on the land sloceially held sered by the Hindus, but as that occured 356 years ago it is too late to remedy the grievence"।

কিন্তু হিন্দুরা এই রায় মেনে নিতে পারেনি। রামমন্দির তৈরির আন্দোলন শুরু হলো। কংগ্রেস প্রাক স্বাধীনতা আন্দোলনে জনগণকে আশ্বাস দিয়েছিল ভারত স্বাধীন হলে হিন্দুর পবিত্র মন্দির--- সোমনাথ-মথুরা-বিশ্বনাথ ও রামজন্মভূমি পুনর্নির্মাণ করে হিন্দুদের স্বপ্ন পূরণ করবে। বিশ্বের ও ভারতের কিছু কিছু গবেষক ও ঐতিহাসিকবিদরাও বললেন একটি দেশের সংস্কৃতি ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য সেই দেশের পুরনো স্থাপত্য উদ্ধারের প্রয়োগটি ভারতে মহেঞ্জোদাড়ো-নালন্দা, ইতালিতে পম্পেই শেক্সপিয়ারের বাসভূমি, পোলান্ডে ক্যাথালিক গির্জা পুনর্নির্মাণ রামভক্ত হিন্দুদের সবসময় প্রেরণা দেয়। কেন্দ্রে যে সরকারই আসীন হোক না কেন, সরকারি আর্কিওলজিক্যাল বিভাগ এই মতকে গুরুত্ব দিয়ে রামকোটে রামজন্মভূমি সরকারি অধীনে আনার প্রস্তাব পেশ করে। গৃহমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল তাঁর official file-এ এর মান্যতা দেন, কিন্তু পরবর্তীকালে কংগ্রেস সরকার মুসলমান ভোটের লোভে হিন্দুদের দাবি নস্যাৎ করে। জনগণ ব্যাপকহারে আন্দোলন শুরু করলে ইউপিএ-র কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী এই জনআন্দোলনের বিরুদ্ধে অর্ডিন্যান্স পর্যন্ত জারি করে। তারা পরে সঙ্গে পায় তার সাম্প্রদায়িক বন্ধু মুলায়ম সিংহকে, যিনি নিজেকে সমাজবাদী নেতা বলেন। তিনি লক্ষ লোকের উপর অত্যাচার হয়। হাইকোর্টের আদেশ উপেক্ষা করে সরযূ নদীর পাড়ে হিন্দুদের পূজা-পরিক্রমার পথ বন্ধ করে দেন। সুপ্রিম কোর্টের আদেশকে মর্যাদা দেননি কংগ্রেস সরকার। হিন্দুরা তাদের সামান্য দাবি— মন্দির নির্মাণও কংগ্রেস সরকার দিতে রাজি হলো না। পাকিস্তান আদায় করে ইসলামিক স্টেট গড়ার পর মুসলমানরা যা দাবি তা হিন্দুবিরোধী হলেও কংগ্রেস তা মানতে দ্বিধা করে না। বলে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ। তাই যদি হয় ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট মুসলিমদের খুশি করার জন্য পাকিস্তান সৃষ্টি করা হলো কেন। কোনও মানুষ যত সভ্য হয়েছে তত ধর্মাবলম্বী হয়েছে। আন্দামানে যারা জঙ্গল থাকে তাদের কোনও ধর্ম নেই, জঙ্গলবাসী পশুদের কোনও ধর্ম নেই, কিন্তু উন্নত বা উন্নতশীল প্রতিটি দেশেই একটা বা দুটো ধর্ম তাদের। কিন্তু আমাদের কংগ্রেস সরকার এসব যুক্তি মানে না। অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র যিনি নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে মঙ্গলময় 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁকে স্মরণ করার জন্য অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি ভারতের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। কারণ রামচরিত্রের মধ্যে ভারতবাসীর অতীত যুগের সামাজিক রীতি-নীতি-সংস্কারের-পরিচয় পাওয়া যায়। সব ভারতীয়ই দেশে 'রামরাজ্য' চায়। সবশেষ জানাতে চাই, ৩ মার্চ ১৯৫১ সালে ফৈজাবাদের বিচারপতি বললেন— '১৯৩৪ সালের পর থেকে মুসলিমরা ওখানে নামাজ পড়ে না এবং হিন্দুরা ওই স্থানে পূজা-অর্চনা করে। কোনও মসজিদে যদি ৬ মাস নামাজ না পড়া হয় সেই স্থানকে আর মসজিদ বলা যায় না।▮

চিঠিপত্র

সাংসদরা এত সুবিধা পান কেন?

নিজের দেশের কথা অর্থাৎ বৈষম্যের কথা লিখতে লজ্জা হওয়া উচিত কিন্তু না লিখেও পারা যায় না। প্রথমে দেশে চাকরির কথায় আসা যাক। ১৬/১৭ বছরের যুবক হন্যে হয়ে শেষপর্যন্ত সেনাবাহিনীতে ঢুকে পড়ল। ঢোকা মানে তাকে বহু কসরত করে তবেই একজন পূর্ণ সৈনিক হবে। ওই বয়সে মুখে কমনীয়তার ছাপ। সেনাবাহিনীতে ঢুকেছে, বাড়িতে যুবতী বোন, বৃদ্ধা মা আর বয়স হয়ে যাওয়া বাবা, যারা ওই ছোট্ট একটি ছেলের জীবিকার অপেক্ষায় সারামাস দিন গোনে। মাধ্যমিক পাশ করে দিনরাত এক করে দেশকে রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। অতন্দ্রপ্রহরী হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য, অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকে। এদের কোনওরূপ সমালোচনা করা উচিত নয়। এরা দেশের মান রাখে। নিজের জীবন দিয়েও দেশমাতৃকাকে রক্ষা করার শপথ নিয়েই সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

পাশাপাশি কোনোরূপ কসরত ছাড়াই দেশের সাংসদরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন দিয়ে এনে দেওয়া স্বাধীন ভারতের সংসদে বসে পড়ে। তাদের কোনো আশঙ্কা থাকে না। তাঁরা মাস গেলে সংসার চালানোর জন্য সবকিছু ফ্রি সমতে দেড় লাখ টাকা প্রতি মাসে পান, এর জন্য কোনো আয়কর দিতে হয় না। অথচ দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে সেনাাবাহিনীর সেনারা ২৫ হাজার টাকা পেলেও তাদের আয়কর দিতে হয়। সাংসদদের ফোন-কলের চার্জ লাগে, না অথচ নিজ বাড়িতে পরিজনদের মাসে একবার কল করলেও কলচার্জ দিতে হয় সেনাদের। সাংসদরা থাকার জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সরকারি ঘরবাড়ি পান আর প্রচণ্ড বর্ষায়, শীতে সেনারা ভাঙা ফুটো ঘরে থেকে দেশকে রক্ষা করে চলে। সাংসদরা বছরে ৩৪ বার মুফতে বিমানে চড়ে কাজের নামে বেরিয়ে পড়ে আর সেনারা ডিউটিতে যাবার সময় তাদের টিকিট কেটে যেতে হয়। সাংসদরা চারচাকা কেনার জন্য বিনাসুদে লোন পান আর সেনারা বাড়ি করার জন্য লোন নিলে ১২.৫ শতাংশ হারে সুদ দিতে হয়। যাদের জন্য আমরা বিছানায় নিশ্চিন্তে আরাম করে ঘুমাতে পারি তাদের সবকিছু পয়সা দিয়ে করতে হবে।

রেডিওতে খেলার খবর শুনে ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করে মা ইন্ডিয়া জিতেছে। যারা খেলে তারা জিতুক কিংবা হারুক ম্যাচ পিছু কোটি টাকা পায়। ছেলের প্রশ্নে মায়ের উত্তর, সরকার বলে ওরা দেশের জন্য খেলে তাই ওদের টাকা দেওয়া হয়। টিভিতে বিমান মহড়া কিংবা হেলিকপ্টার থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে দড়ি ধরে নামতে দেখে মাকে ছেলে জিজ্ঞাসা করে, মা এরাও কি এক কোটি করে টাকা পায়? মা বলে, না বাবা দেশের ছেলেরা ব্যাটেবলে খেলে জিতুক কিংবা হারুক এক কোটি করে টাকা পাবে, সেনারা জীবন নিয়ে খেললেও পাবে না, এটাই দেশের নিয়ম।

—**দেবপ্রসাদ সরকার,**
মোমারী, বর্ধমান।

রাহুল গান্ধীর কোনও গোত্র নেই

'গোত্র জানালেন রাহুল, বিপাকে বিজেপিই' শীর্ষক প্রতিবেদনে (২৯.১১.১৮) কলকাতার প্রথম শ্রেণীর এক বাংলা দৈনিকের নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন, মধ্যপ্রদেশের ভোট প্রচারে বিজেপি পৈতেধারী রাহুল গান্ধীর গোত্র নিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়েছিল। ভোটের ঠিক আগে রাহুল নিজের গোত্র জানাতেই ব্যাকফুটে বিজেপি।

গত ২৭ নভেম্বর রাহুল 'অজমেড়ে' খাজা মইনুদ্দিন চিস্তির দরগা হয়ে হয়ে রাজস্থানের পুষ্করে ব্রহ্মার মন্দিরে গিয়ে পূজা দেন; এবং সেখানেই খোলসা করেন, তিনি দত্তাত্রেয় গোত্রের কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ। সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, রাহুল নিজে কিছু প্রকাশ্যে বলেননি। কিন্তু মন্দিরের পুরোহিত জনে জনে রেকর্ড দেখিয়ে জানান, এর আগে মোতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, সঞ্জয় গান্ধী, মেনকা (SIC) গান্ধী, সোনিয়া গান্ধীও এসে পুজো দিয়ে গিয়েছেন। রাহুলও পুজো দেওয়ার সময়ে নিজের গোত্র জানিয়েছেন। কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিংহও টুইট করেন : "আর কত প্রমাণ চাইবে বিজেপি?" কিছুই প্রমাণ হয়নি। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সিংহ মহাশয় ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখবেন, রাহুল গান্ধীকে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ বলে মেনে নিতে হলে তাঁদের 'বাপুজী' মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকেও 'গুজরাটি ব্রাহ্মণ' বলতে হয়।

'গোত্র' বলতে বংশপ্রবর্তক ঋষির সন্তান পরম্পরা বুঝায়। বিয়ে হলে কন্যাসন্তানের গোত্র পতির গোত্রে গোত্রান্তরিত হয়। বিশ্ব ভারতীর প্রাক্তন ড. নিমাইসাধন বসুর 'আমি : ইন্দিরা গান্ধী' পুস্তকসূত্রে জানা যায়, ফিরোজ গান্ধী এলাহাবাদের এক পার্শি পরিবারের সন্তান। পার্শিদের মধ্যে গোত্র বিচার নেই। স্বভাবত, ফিরোজ গান্ধীরও কোনও গোত্র ছিল না। ফলে, ইন্দিরা নেহরু 'ইন্দিরা গান্ধী' হয়ে যাওয়ার পর তিনিও গোত্রহীন হয়ে যান। তাই, তাঁদের পুত্র রাজীবের কোনও গোত্র ছিল না; তস্য পুত্র রাহুলেরও কোনও গোত্র নেই। রাহুলের নিজেকে দত্তাত্রেয় গোত্রের কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ বলে দাবি, নিতান্ত মিথ্যাচার।

রাহুল গান্ধীর ঠাকুরদাদা ফিরোজ গান্ধীর পিতৃ-পরিচয় নিয়ে ধোঁয়াশা বিদ্যমান। গলায় পৈতে ঝুলিয়ে নিজেকে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ বলে জাহির না করে, তিনি বরং তাঁর ঠাকুরদাদার পিতা-পিতামহের এবং ওই বংশের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের প্রকৃত পরিচয় জানুন, আমাদের সবাইকে তা জানান ও দীর্ঘদিনের অপ্রীতিকর বিতর্কের অবসান ঘটান।

ব্রহ্মা মন্দিরের পুরোহিত কোন বিচারে 'গান্ধী' পদবিধারী রাহুলকে 'ব্রাহ্মণ' বলে মেনে নিলেন, সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না; তবে তাঁর জনে জনে দেখানো 'রেকর্ড' প্রসঙ্গে কিছু বলতেই হয়। জওহরলাল তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, ছেলেবেলায় বাবা এবং তুতো দাদাদের ধরন-ধারণ দেখেশুনে

তাঁর মনে হতো, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সব মেয়েদের ব্যাপার (''Of religion...It semed to be a woman's affair. Father and my older cousins treated the question humorously and refused take it seriously...")। তিনি কখনও কখনও মা (স্বরূপরানি নেহরু) ও মাসি-পিসিদের সঙ্গী হয়ে গঙ্গায় ডুব দিতে ('for a dit') যেতেন, মাঝেমধ্যে এলাহাবাদ, বারাণসী বা অন্য কোথাও মন্দির বা কোনও নামকরা সাধু-সন্ন্যাসী দেখতে যেতেন। তবে সেসব তাঁর মনে কোনও রেখাপাত করেনি ('But all this left little impression on my mind.')। তাই একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, মোতিলাল নেহরু, জওহরলাল যদি কখনো পুষ্করে ব্রহ্মার মন্দিরে গিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে সেখানে যাননি; তাঁরা স্বরূপরানিদের সঙ্গী হয়েই গিয়েছিলেন। মন্দিরের পুরোহিতের খাতায় ইন্দিরা গান্ধী থেকে শুরু করে সোনিয়া গান্ধীরও নাম আছে; কিন্তু, স্বরূপরানি বা নেহরু পরিবারের মহিলাদের কারও নাম নেই। তাই নিশ্চিতরূপে বলা যায়, মোতিলাল বা জওহরলাল কখনও ওই মন্দিরে যাননি। মঠ-মন্দিরে জওহরলালের বিরাগের কথাও সুবিদিত। পুরোহিতের প্রদর্শিত খাতার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

'পথ দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে সমস্ত মৃত্যুতে' হিন্দুরা ক্ষতিপূরণ পায় না

গত ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যাবেলা জয়নগরের দুর্গাপুর পেট্রল পাম্পে দুষ্কৃতীদের বোমা-গুলিতে এক তৃণমূল নেতা-সহ তিন যুবক খুন হন। ২৬ ডিসেম্বর নিহত তিনজনের পরিবারের হাতে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন— 'আমরা পথ দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে সমস্ত মৃত্যুতে সরকারি সাহায্য করে থাকি।' বোমার আঘাতে তৃণমূল নেতা সারফুদ্দিন খান, আমিন আলি সর্দার ও মইনুল হক মোল্লার মৃত্যু হয়। মুখ্যমন্ত্রী সেই তিনটি পরিবারের সদস্যদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিয়ে পুনরায় মানবিকতার নজির গড়লেন।

ইতিপূর্বে মুখ্যমন্ত্রী বিষ মদ কাণ্ডে মৃত লোকদের পরিবারের হাতে দু' লক্ষ টাকা হিসেবে তুলে দিয়ে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তারও আগে মালদহের বাসিন্দা আফরাজুলকে রাজস্থানে হত্যা করা হলে মুখ্যমন্ত্রী আফরাজুলের পরিবারকে তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া সহ পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার ঘোষণা, আফরাজুলের তিন মেয়ের পড়াশোনা সহ যাবতীয় বিষয়ে সরকারের ওই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। সেই সময় মালদহে আফরাজুলের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন— তৃণমূলের ফিরহাদ হাকিম, সিপিএমের মহম্মদ সেলিম, কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী ও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি।

তারও আগে মুখ্যমন্ত্রী আরও কয়েকজন বিষাক্ত মদপানে মৃত ব্যক্তির হতভাগ্য পরিবারের হাতে দু' লক্ষ করে টাকা তুলে দিয়েছেন। এটা মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক গুণেরই পরিচয় প্রকাশ করে।

কিন্তু একইভাবে যদি হিন্দু পরিবারের কারও মৃত্যু হয় কিংবা মেরে ফেলা হয় তখন মুখ্যমন্ত্রীর মানবিকতা প্রকাশ পায় না বা মহম্মদ সেলিম, অধীর চৌধুরী কিংবা ফিরহাদ হাকিমের সেই পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর কথা মনেও আসে না। আর এ কারণেই গ্রামেগঞ্জে সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোচনায় উঠে আসে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন পশ্চিমবঙ্গকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সরকার চলছে।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতেই পারে যে, কোচবিহারের মদন রায় গুজরাটে কাজে গেলে সেখানকার দুষ্কৃতীরা আফরাজুলের মৃত্যুর কয়েকদিন পরে তাকে মেরে ফেলে। তার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী মদন রায়ের মায়ের শোক নিবারণের উদ্দেশে কোনও বাণী বিতরণ করেননি বা একটা টাকাও মদন রায়ের মায়ের হাতে তুলে দেননি। আর সেখানে যাওয়ার সময় পাননি ফিরহাদ হাকিম, মহম্মদ সেলিম ও অধীর চৌধুরীও।

উত্তরদিনাজপুরের দাড়িভিট স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের প্রতিবাদে আন্দোলনে দুজন ছাত্রের মৃত্যু হয়। স্থানীয় লোকেরা বলেছেন, পুলিশ ইচ্ছা করেই গুলি করে তাদের হত্যা করেছে। এক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে কোনও সমবেদনার কথা প্রকাশ পায়নি। এবং তিনি ওই দুই ছাত্রের পরিবারের হাতে কোনও ক্ষতিপূরণ বাবদ সামান্য পরিমাণ অর্থও তুলে দেননি। অথচ ২৬ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন— ''আমরা পথ দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে সমস্ত মৃত্যুতে সরকারি সাহায্য করে থাকি।" এখানেও ফিরহাদ হাকিম, মহম্মদ সেলিম বা অধীর চৌধুরীদের ওই ছাত্রদের জন্য প্রাণও কাঁদেনি। এরা সবাই হিন্দু বলে কি?

স্বভাবতই সাধারণ লোকেরা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক তকমা সেঁটে দিয়ে বলছেন--- 'ভোটের লোভে মুখ্যমন্ত্রী সাম্প্রদায়িক বিভাজন করার চেষ্টা করছেন মুসলমানদেরকে সরকারি অর্থ বিলিয়ে আর হিন্দুদের সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত করে। শুধু লালপাড় শাড়ি পরে হিন্দুদের দেব-দেবীর পায়ে মাথা ঠুকে মুখ্যমন্ত্রীর কোনই লাভ হবে না।"

সাধারণদের এই মন্তব্য আমার কাছে বড়োই পীড়াদায়ক।

—**মণীন্দ্রনাথ সাহা,**
গাজোল, মালদহ।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম মহিলা সাহিত্যিক ও সমাজসেবিকা স্বর্ণকুমারী দেবী

মালিনী চট্টোপাধ্যায়

স্বর্ণকুমারী দেবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সারদাসুন্দরী দেবীর একাদশ সন্তান ও চতুর্থা কন্যা। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ন-দিদি তিনি। কিন্তু স্বীয় প্রতিভা, অধ্যবসায় ও প্রখর ব্যক্তিত্বের দ্বারা তিনি এই পরিচয়ের বাইরেও নিজস্ব একটি পরিচয় গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে সংগীত রচনার সময় এই ভগিনীটির রচনা দ্বারা সামান্য প্রভাবিত হয়েছিলেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী কোনও বিদ্যালয়ে পড়েননি। কোনওদিন বিদ্যালয়ে না গিয়েও তিনি বিদূষী হয়ে ওঠেন। বাল্যকালে স্বর্ণকুমারী ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য গৃহশিক্ষক অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর কাছে অধ্যয়ন করতেন। নিতান্ত বাল্যকাল থেকে তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তার রচিত 'জীবনস্মৃতি'তে এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ''আমার একটি কনিষ্ঠ ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোটো ছোটো গল্প রচনা করিয়াছিলেন। তিনি আমায় সেইগুলি শুনাইতেন। আমি তাহাকে খুব উৎসাহ দিতাম, তিনি তখনও অবিবাহিতা।''

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ১৭ নভেম্বর মাত্র এগারো বছর বয়সে স্বর্ণকুমারীর পরিণয় ঘটে কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত জয়রামপুরের ধনাঢ্য জমিদার জয়চন্দ্র ঘোষালের পুত্র জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে। স্বাধীনচেতা জানকীনাথ পিতার অমতে বিবাহ করেন। ঠাকুরবাড়ির অন্য জামাতাদের মতো তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেননি এবং গৃহজামাতার জীবন অতিবাহিত করেননি।

সুশিক্ষিত স্বামীর উৎসাহে বিবাহের পরও স্বর্ণকুমারী দেবী বিদ্যাচর্চায় ও সাহিত্যরচনায় রত থাকেন। আঠারো বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' রচনা শুরু করেন।

এটি দু'বছর পর প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে তিনি তিনটি কন্যাসন্তান ও একটি পুত্রসন্তানের জননী। এই উপন্যাস রচনা শুরু করার সময় তার প্রথম সন্তানের বয়স ছয় এবং কনিষ্ঠা কন্যা সদ্য জন্মগ্রহণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে তিনি কী করে উপন্যাস রচনা করেন ভাবতে বিস্ময় জাগে।

কন্যা সরলাদেবী চৌধুরাণীর পরিণত জীবনে রচিত আত্মজীবনী 'জীবনের ঝরাপাতা' পড়ে সে বিস্ময় অপনোদিত হয়। ''সেকালের ধনীগৃহের শিশুরা মাতৃস্তন্যের বদলে ধাত্রীস্তন্যে পালিত ও পুষ্ট হতো। দাসীর কোলই আমাদের মায়ের কোল হতো। মায়ের আদর কী তা জানিনে, মা কখনো চুমু খাননি গায়ে হাত বোলাননি।''

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'ছিন্নমুকুল'। স্বর্ণকুমারী দেবীর সংগীত রচনায় আগ্রহের পরিচয় এই উপন্যাসে পাওয়া যায় :

''রিমঝিম ঘন বরিষে—সখিলো
বিরহী নয়ন পারা, ঢালিছে শ্রাবণধারা
কি জ্বলে মরমে জ্বালা, নিভাই কেমনে সে,
গুরু গুরু গর্জনে, গর্জে নবীন ঘন,
দলকে দামিনী বিকাশে।''

রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি প্রতিভা'র 'রিমঝিম ঘন-ঘন রে' সংগীতটি সম্ভবত এই সংগীত অবলম্বনেই রচনা করেন।

এরপর স্বর্ণকুমারী দেবীর জীবনে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। ছাদ থেকে পড়ে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা ঊর্মিলার মৃত্যু হয়। এ বছরই প্রকাশিত হয় তাঁর বয়স্ক উৎসব গীতিনাট্য, বাংলাভাষার প্রথম ঋতু-উৎসব সংক্রান্ত গীতিনাট্য এটি।

এরপর স্বর্ণকুমারী দেবী একাধিক ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস রচনা করেন— 'ফুলের মালা', 'মেবার রাজ', 'বিদ্রোহ', 'স্নেহলতা', ও 'কাহাকে'। 'কাহাকে' আজও সমালোচকদের মুগ্ধ করে।

সাহত্যি-রচনা ছাড়াও স্বর্ণকুমারী দেবীর নানা বিষয়ে উৎসাহ ছিল। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতী অলকটের উৎসাহে তিনি 'বেঙ্গল থিয়োসফিকাল সোসাইটি'র সভ্য হন। এই সভার মহিলা শাখার তিনি সভানেত্রী ছিলেন। পরবর্তীকালে এই সভার সভ্যাদের নিয়েই তিনি 'সখিসমিতি' গড়ে তোলেন। এখানে কুমারী ও বিধবা মেয়েদের বৃত্তি দিয়ে পড়ানো হতো এবং পড়া সাঙ্গ হলে তাদের বেতন দিয়ে অন্তঃপুরচারিণীদের শিক্ষয়িত্রী রূপে নিয়োগ করা হতো।

১৮৮৪ থেকে ১৮৯৬ সুদীর্ঘ এগারো বছর স্বর্ণকুমারী 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে স্বর্ণকুমারী প্রথম মহিলা সাহিত্যিক হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পুরস্কার লাভ করেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর জীবন আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কোনওদিন বিদ্যালয়ে না গিয়ে যেভাবে তিনি বিদ্যালাভ করে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা সাহিত্যিক ও সমাজসেবিকা হয়ে ওঠেন, তা এ যুগের নারীদেরও অনুসরণযোগ্য। ■

চোখের সুস্থতা ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

আমাদের শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো চোখ। আর যাঁরা ক্রমাগত অফিসে কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করেন, তাঁদের চোখের উপরে যে চাপ পড়ে, তা বলাই বাহুল্য। আবার ক্রমাগত বই পড়া, টিভি দেখা বা সেলাইয়ের মতো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজেও চোখে চাপ পড়ে। কিন্তু আমাদের মধ্যে এরকম মানুষ প্রচুর রয়েছেন, যাঁরা চোখের সঠিক যত্ন নেন না। তাই চোখের সুস্থতা বজায় রাখতে কয়েকটি সাধারণ অভ্যেস মেনে চলুন। কেননা চোখ চলে যাওয়া মানে জীবনের প্রায় সবটাই অন্ধকার।

১। **কম্পিউটার ব্যবহারের সতর্কতা :** দীর্ঘক্ষণ মানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কম্পিউটারের সামনে

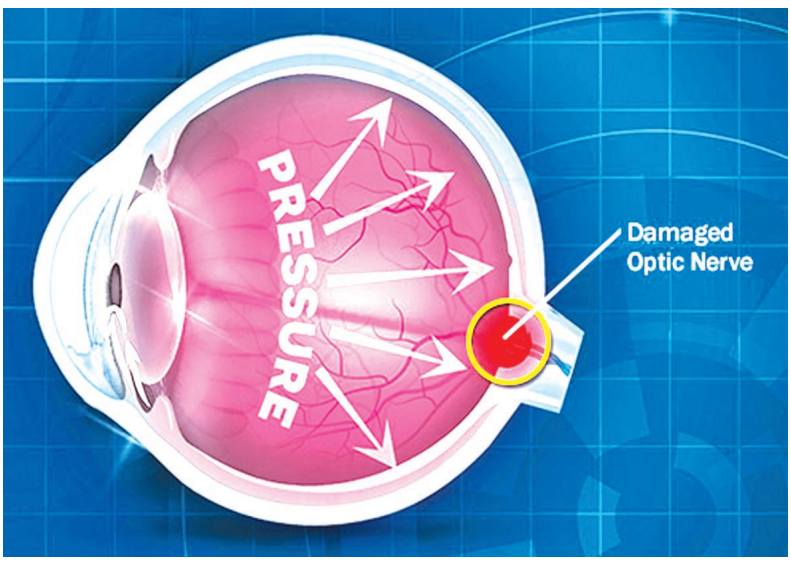

বসে কাজ করছেন, অথচ একবারও উঠছেন না, ব্রেক নিচ্ছেন না, তাতে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হওয়ার পাশাপাশি চোখেরও ক্ষতি হয়। তাই ৪৫ মিনিট বা এক ঘণ্টা অন্তর কাজের ফাঁকে ব্রেক নিন। না হলে ক্রমাগত চোখ শুকিয়ে ড্রাই আইয়ের সমস্যা হয়, যার উপসর্গ মাথা ব্যথা, চোখ লাল হওয়া, চুলকানি, একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকার অসুবিধে। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হয় দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারে বসে কাজ করতে হলে মাঝে মাঝে গ্লিসারিনযুক্ত ল্যুব্রিকেটিং আইড্রপ চোখে লাগান। এতে ড্রাইনেসের সমস্যা কমবে। কিন্তু ব্রেকটা মাস্ট। কম্পিউটারে কাজ করা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলেন যতটা দূর থেকে সম্ভব মনিটার অপারেট করুন। একনাগাড়ে টিভি দেখে গেলে বা রাতদিন স্মার্টফোন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলেও এ ধরনের সমস্যা হয়। কম্পিউটার প্রয়োজন আর স্মার্টফোন আসক্তি, তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহার করবেন না, এতে চোখ বিশ্রাম পাবে।

২। **চশমা পরা মানেই ভিশন কমে যাওয়া নয় :** যাঁরা চশমা পরেন, তাঁদের কিছুদিন পর পর হয়তো চশমা বদলাতে হতে পারে। এর কারণ আর কিছুই নয়, অপটিক্যাল পাওয়ারের পরিবর্তন। আর বয়স চল্লিশ পেরোলেই, এই পাওয়ার ওঠানামাটা একটু বেশি হয়, কারও বাইফোকাল চশমার দরকার হয়। অনেকের মধ্যেই একটা ধারণা রয়েছে যে চশমা পরার ফলে দৃষ্টিশক্তির ক্রমশ অবনতি হচ্ছে, ভিশন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা আদতে তা নয়। বয়স বাড়ার ফলে দৃষ্টিশক্তি আপনা থেকেই দুর্বল হতে থাকে। তাছাড়া অনেকেরই প্রি ম্যাচিওর ছানি হয়, সেজন্য দৃষ্টিশক্তি যদি পাওয়ার বদলানোর পরও ঠিক না হয়, সেক্ষেত্রে চিকিৎসকে দেখিয়ে নিন।

৩। **মেকআপ থেকেও ক্ষতি হতে পারে :** মোটা, কালো আঁখিপল্লব দেখানোর জন্য মোটা কোট করে মাসকারা লাগানো, কিংবা আইলাইনার বা আইশ্যাডোর রঙে চোখকে আকর্ষণীয় করে তুলতে সকলেই চান। কিন্তু ব্যবহার করার সময় অসাবধানতাবশত যদি তার সামান্য অংশও চোখের ভিতর চলে যায়, তাহলে তা খুবই ক্ষতিকর। অনেক সময় দেখা যায় লিক্যুইড আইলাইনার ভালোভাবে না শুকিয়ে চোখের সাদা অংশে ঢুকে গেল। তখন প্রচণ্ড জ্বালা করে। সে সময় আইলাইনার তুলে চোখে ভালো করে জলের ঝাপটা দিন। আর মেকআপের কোনও শক্ত অংশ বা পাউডার জাতীয় কিছু চোখে ঢুকলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়।

৪। **ধূমপান থেকে হতে পারে ক্ষতি :** ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য যে ক্ষতিকর, তা না হয় নতুন করে আর বললাম না, কিন্তু চোখের জন্যও এটি অসময়ে বিপদ ডেকে আনতে পারে। ধূমপানের কারণে অক্ষিপট বা অপটিক নার্ভ বা মস্তিষ্কের সঙ্গে চোখের সংযোগকারী যে স্নায়ু তার ক্ষতি করে। ফলে দৃষ্টিশক্তির উপর নেতিবাচক প্রভাব তো পড়েই। ভবিষ্যতে অন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও বিরল নয়।

৫। **রাত্রে লেন্স পরে ঘুমানো :** এটা একদম করবেন না। পাওয়ারের জন্যই হোক বা ফ্যাশনের জন্য, কোনও কনট্যাক্ট লেন্সই আট ঘণ্টার বেশি পরে থাকা উচিত নয়। অনেক লেন্সের উপরে লেখা থাকে, রাত্রে শোওয়ার সময় পরা যাবে, তবে রাতে লেন্স পরে না শোওয়াই ভালো। আর ঘুমানোর আগে অতি অবশ্যই অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল লেন্স সলিউশনে লেন্স ভিজিয়ে রাখতে হবে।

৬। **গ্লুকোমার সতর্কতা :** খুব ভালো ভিশন আছে, কিন্তু হয়তো ভিতরে ভিতরে বাসা করেছে চোখের প্রেসার। যার ফলে মাঝে মাঝে মাথার পিছনটা একটু ব্যথা করে, আবার ওষুধ খেলে থেমে যায়। এরকম যদি টানা তিন মাস চলে তাহলে চিকিৎসককে দিয়ে চোখের প্রেসার মাপিয়ে গ্লুকোমা হয়েছে কিনা দেখে নিন। কেননা গ্লুকোমা সাইলেন্ট কিলার, ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে। ■

সাগর সঙ্গমে

বিজয় আঢ্য

সেই ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি— 'সব তীর্থ বার বার গঙ্গাসাগর একবার'। গঙ্গাসাগর একবার কেন? কেননা খুব দুর্গম। সাগর পেরিয়ে সে তীর্থে যেতে হয়। স্কুলের শেষসীমায় পৌঁছে যখন রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' বা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র নবকুমারের কাহিনি পড়েছি, তখন কেমন যেন গঙ্গাসাগর নিয়ে একটা সমীহ ভাব। ওই বয়েসে তীর্থ মাহাত্ম্যের থেকে তীর্থে পৌঁছোনোটাই বড়ো কথা। একটু বড়ো হয়ে সেই ভয়মিশ্রিত ভক্তি আর থাকেনি। যত দিন গড়িয়েছে, যাতায়াতের সুবিধাও অনেক বেড়েছে। মেলার সময় বার দুয়েক গিয়েছি, অন্য সময়ে বেশ কয়েকবার। মেলার সময়কার কথাটাই বলি। কাকদ্বীপ হয়েও গঙ্গাসাগর যাওয়া যায়, আবার নামখানা দিয়েও যাওয়া যায়। দু'বার দুদিক দিয়েই গিয়েছি। তবে ভিড় দুদিকেই। একবার বাসে যাওয়ার অভিজ্ঞতা এরকম— ডায়মন্ডহারবার থেকে বাসে উঠেছি। প্রচণ্ড ভিড়, দাঁড়ানো যায় না। এর মধ্যে বাস কন্ডাকটার বেশি ভাড়া চাইছে। মেলার জন্য যে বাসে বেশি ভাড়া দিতে হবে, বেশিরভাগ যাত্রীই তা জানে না। তাই নিয়েই বচসা শুরু হয়েছে। উপায়ন্তর না দেখে বোধহয় বাস একটা পুলিশ চৌকির সামনে এসে থামল। দু'জন পুলিশ এসে কয়েকজন যাত্রীকে ধরে নিয়ে গেল। তাদের মধ্যে আমিও আছি। তা কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ চলল। প্রেস কার্ডটা দেখাতে অবশ্য ছেড়ে দিল। এমন হ্যাপা পেরিয়ে যখন নামখানায় পৌঁছালাম, তখন লঞ্চের জন্য দীর্ঘ লাইন। শীতকাল। রাত প্রায় ৯টা। শেষমেশ যখন সাগরে পৌঁছলাম, তখন ঘড়ির কাঁটা এগারোটার আশেপাশে। তবে আলোর অভাব নেই— ফ্লাড লাইটের আলোয় ঝলমল করছে। সারি সারি চট দিয়ে ঘেরা ছাউনি। নীচে খড় পাতা। তীর্থযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা। তবে পয়সা ফেললে হোটেলও আছে। হাল আমলের কথা বলতে পারব না, বছর পনেরো-কুড়ি আগে হোটেলের সংখ্যাও বেশি ছিল না। আমি অবশ্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডেরাতেই মাথা গুজলাম। তা, ওই রাতেই অরবিন্দদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি তাঁর পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। ভোরবেলা একসঙ্গেই সাগর-স্নানে যাওয়া স্থির হলো। একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম, অত রাতেও তীর্থযাত্রীদের আসার বিরাম নাই। বেশির ভাগই বয়স্ক। পাঁচ-ছয়জনের এক একটা গ্রুপ। সঙ্গে ব্যাগপত্তর, পোটলা। সে বছর কুম্ভমেলা ছিল না। তাই ভিন রাজ্যের মানুষরাও এসেছেন, বিশেষত উত্তর ভারত থেকে। তারা দলবেঁধে এক একটা ছাউনিতে আশ্রয় নিয়েছেন।

রাতের অন্ধকারটা সবে ফিকে হতে শুরু করেছে। তখন থেকেই কানে আসছে— হর হর গঙ্গে, গঙ্গা মাঈ কী, কপিল বাবা কী...। বাংলার এই একটাই তীর্থক্ষেত্র যেখানে একটা বিশেষ তিথিতে হলেও ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের মানুষ পুণ্য স্নানের জন্য এসে উপস্থিত হন। কতকাল আগে থেকে পুণ্যার্থীরা যে এখানে আসছেন তা জানি না, তবে যে ঘটনাকে স্মরণ করে তাঁরা আসছেন, তা অতি প্রাচীন। মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ছিলেন রাজা সগর। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের সংকল্প করেন। সেই যুগের নিয়ম অনুসারে একটি অশ্বকে যজ্ঞের জন্য উৎসর্গীকৃত হিসেবে চিহ্নিত করে ছেড়ে দেওয়া হতো। কেউ সেই অশ্বের গতি রোধ করলে

তাকে যুদ্ধে পরাজিত বা হত্যা করে অশ্বকে যজ্ঞস্থলে ফিরিয়ে পূর্ণাহুতি দেওয়া হতো। যুদ্ধে জয়ী রাজা রাজচক্রবর্তী বা সম্রাট হিসাবে যশস্বী হতেন। সিংহাসন চ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় স্বর্গের রাজা ইন্দ্র সেই অশ্বকে কপিল মুনির আশ্রমে বেঁধে রেখে আসেন। সেই অশ্বের সন্ধানে রাজা সগর সৈন্যসামন্ত-সহ পুত্র-পৌত্রদের পাঠিয়েছিলেন। সংখ্যাটা নাকি ষাট হাজার। কপিলমুনির আশ্রমে সেই অশ্বের সন্ধান পেয়ে সগরের পুত্র-পৌত্ররা মুনিকেই অপহরণকারী হিসেবে তিরস্কার করতে থাকেন। তপস্যায় বাধা সৃষ্টির জন্য ক্ষুব্ধ মুনির দৃষ্টিপাত মাত্র সগরের পুত্র-পৌত্ররা ভস্ম হয়ে যান। যজ্ঞ থেকে যায় অসম্পূর্ণ। সগরের উত্তরপুরুষ ভগীরথ তপস্যা করে গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নিয়ে আসেন। গঙ্গা যেখানে সাগরে মিলিত হয়েছেন, সেখানেই কপিল মুনির আশ্রম। গঙ্গার পবিত্র স্পর্শে ভগীরথের পূর্বপুরুষেরা পৌষ মাসের মকর সংক্রান্তি তিথিতে এই পবিত্র সঙ্গমে মুক্তি পেয়েছিলেন বলে নিজেদের মুক্তি কামনায় প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে সমবেত হন। এবারে আমরাও যেমন এসেছি। এভাবে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থীদের সমাগমে সাগর সঙ্গম এ সময় হয়ে ওঠে এক ক্ষুদ্র ভারত, পুণ্য ভারত।

আদি কপিলমুনি মন্দির সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি নবনির্মিত। তিনটি চূড়া বিশিষ্ট এই মন্দিরে রয়েছে সাধক তপস্বী কপিলমুনির বিগ্রহ। বেদের উপনিষদ ভাগে কপিলের নাম পাওয়া যায়। ঋষি কর্দম ও দেবহুতির পুত্র কপিল সিদ্ধপুরুষ। গীতার দশম অধ্যায়েও শ্রীভগবান বলেছেন, সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে তিনি হলেন কপিল— 'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ'। সাংখ্যদর্শনের তিনি প্রণেতা।

কপিলমুনির প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। কর্মসূত্রে তখন আরামবাগে রয়েছি। এক বন্ধুর বাবা তখন আরামবাগ কলেজের দর্শনের অধ্যাপক। একদিন তাদের বাড়িতে যেতে বন্ধুর বাবা হাসতে হাসতে বললেন, আজ কী পড়াবো জানো বিজয়? আমি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতে তিনি বললেন, 'প্রমাণা ভাবাৎ ঈশ্বর নাস্তি'— প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর নেই। আর কথাটা বলেই তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, যিনি বলেছেন ঈশ্বর নেই, তাকেই ঈশ্বর বানিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক এখন পূজা করছে। বুঝলে, এটা ভারতবর্ষ। এখানকার মানুষ সর্বভূতে ঈশ্বর দেখে। এখানে তোমার কমিউনিজম চলবে? তা গঙ্গাসাগর মেলায় এসে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গেল।

গঙ্গাসাগরের জল গঙ্গার মতোই অনেকটা ঘোলাটে। সমুদ্রের নীলবর্ণ সেখানে নেই। ঢেউও পুরী বা দীঘার মতো অতটা উত্তাল নয়। তা উত্তাল না হলে কী হবে। আমরা একাত্মতা যজ্ঞের রথযাত্রার সময় এই এখানে দাঁড়িয়েই একসঙ্গে গেয়েছিলাম— 'উত্তাল তরঙ্গ বেষ্টিত বক্ষে দক্ষিণে জলধি নাহি ভয়...। সেই ১৯৮৩ সালে গঙ্গাবারি নিয়ে সারাদেশে যে জাগরণ দেখা গিয়েছিল, তা আজও অনেকের স্মরণে আছে। তারই একটি রথযাত্রার সূচনা হয়েছিল এই গঙ্গাসাগরে। সেই যাত্রার সূচনা পর্বের দায়িত্ব ছিল আমাদের কয়েকজন বন্ধুর ঘাড়ে।

সেই কাকভোর থেকেই স্নানের জন্য সমুদ্রে মানুষের ঢল নেমেছে। তবে এখন ভাটার টান। অনেকটা হেঁটে যেতে হচ্ছে। শীত যে কাউকে কাবু করতে পারেনি, তা তাদের 'বডি ল্যাঙ্গুয়েজ' দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সবার মুখেই এক তৃপ্তির ছোঁয়া। আগে শুনেছি, এখন দেখলাম বাছুরের লেজ ধরে বৈতরণী পার হওয়ার দৃশ্য। দেখলাম সাধুদের ছাউনি। সারিবদ্ধ ছোটো ছোটো কুঠরি। তার এক একটিতে কয়েকজন সাধু। অনেকের গায়ে ভস্ম মাখা। পরনে সামান্য একটা কৌপীন, কারও বা তাও নেই। কেউ প্রসাদ চাইলে চিমটি দিয়ে একটা অঙ্গারের টুকরো তুলে দিচ্ছেন। ঈদানীং এঁদের সংখ্যা বাড়াতে নানা সংস্থার পক্ষ থেকে কলকাতার বাবুঘাটের কাছে অস্থায়ী শিবির করা হচ্ছে। গঙ্গাসাগর যাত্রীদের বিশেষত সাধু-সন্তদের কষ্ট যাতে লাঘব হয়, সেইজন্যই এই ব্যবস্থা। স্থানীয় প্রশাসনও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

স্বামীজী এই দেশের নার্ভটা ঠিকই বুঝেছিলেন। যতই স্মার্ট সিটি, ডিজিটাল ইন্ডিয়া হোক না কেন, এদেশে মা-কালী পাঁঠা খাবেন, কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন আর ষাঁড়ে চেপে শিব ডমরু বাজাবেন। সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে এই জীবন প্রবাহ নিরন্তর চলে আসছে। এই যে জীবন প্রবাহ, যা শুধু সর্বজীবে নয়, সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করে। এদেশের মানুষ যাকে ধর্ম বলে, যা এই জাতির নিজস্ব সত্তা— তা কখনও বিসর্জন দেয়নি। সাগরসঙ্গমেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সংবিধানের 'ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত'-এর ভারত রূপটিই এই মেলায় মূর্ত হয়ে উঠে। ■

শ্রী ও সমৃদ্ধির প্রতীক হেমন্তের পৌষ লক্ষ্মী

নন্দলাল ভট্টাচার্য

পৌষ এলো রে পৌষ। হিমমাখা কচি ঘাসের পথ ধরেই এই বঙ্গে আবির্ভাব ঘটে হেমন্তলক্ষ্মীর। পৌষলক্ষ্মী নামেও পূজিতা তিনি বাংলার ঘরে ঘরে। তাঁর দিব্য প্রসাদে বিস্তীর্ণ মাঠ ভরে ওঠে সোনালি ফসলের ভারে ভারে। সমৃদ্ধির আনন্দরেখা ফুটে ওঠে গণ-আননে। সকল শ্রেণীর মানুষের মনই হিন্দোলিত হয় নব নব আনন্দ রাগে। মানসিক সেই প্রশান্তিই দেবী বন্দনায় ঝরে পড়ে ভক্তি অর্ঘ্যরূপে। ঘরে ঘরে নবপ্রাশনের সঙ্গেই হয় পৌষলক্ষ্মীর আরাধনা।

বাংলা বছরের নবম মাস পৌষ। অন্য নাম যার সৌভাগ্য মাস। নতুন ওঠা শস্য আর প্রকৃতির রূপ-রূপান্তর সকলকেই করে তোলে আনন্দমুখর। পত্রে-পুষ্পে, জীবজগতেও দেখা যায় বিচিত্র সব রং-ভাবনা। সকলেই সুখ বিহ্বল। আবেগ-ঘন হৃদয় সুখ ও আনন্দের মূলীভূত শক্তি দেবীর প্রতি অন্তর-উজাড় করা কৃতজ্ঞতা জানাতেই মেতে ওঠে দেবী লক্ষ্মীর বিশেষ পূজার্চনার।

পৌষলক্ষ্মী অভয়দায়িনী। সম্পদ প্রদায়িনী। তাই তিনি পৌষের এই হেমন্ত-বেলায় ধনলক্ষ্মী— ধান লক্ষ্মী। ধানই ধন। তাই তো ধান্যলক্ষ্মী রূপেই আরাধিতা।

লক্ষ্মীই নারায়ণী। শ্রী ও সমৃদ্ধির প্রতীক। গৃহস্থের ঘরে ঘরে প্রতি বৃহস্পতিবারে তিনি হন অর্চিতা। সারা বছর ধরেই চলে তাঁর উপাসনা। কোজাগরী বা দীপান্বিতায় যেমন হয় দেবীপূজা, তেমনই পৌষ, চৈত্রে বা ভাদ্রে হয় লক্ষ্মীর বিশেষ পূজা। অঞ্চল ভেদে এক এক মাসে এক এক নামে হয় এই লক্ষ্মী পূজা।

আশ্বিন-কার্তিকে কোজাগরী ও দীপান্বিতার লক্ষ্মী পূজার পরই বিশেষ করে কৃষি-নির্ভর পল্লিবাংলার ঘরে হয় কৃষি বা ভূমিলক্ষ্মীর এই আরাধনা। পৌষলক্ষ্মীর এই পূজা হয় কখনও সরায় আঁকা পট বা লক্ষ্মী-সরায়। কখনও বা হয় ধানের পাত্রে। নতুন ফসলের অন্ন দিয়ে বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গেই পূজা হয় দেবীর।

সাধারণ লক্ষ্মীপূজার মতোই পৌষলক্ষ্মীর পূজারও মূল আয়োজন করেন ঘরের মহিলারাই। পূজার জন্য কখনও ডাকা হয় পুরোহিতকে, কখনও বা বাড়ির বউরাই সাঙ্গ করেন সেসব কাজ। পল্লিবাংলায় বিগত অতীতেও তখন বাড়ির অঙ্গন নিকোনো হতো গোবর-জলে। ধানের মড়াইতে দেওয়া হতো শ্রী-চিহ্ন। পিটুলি দিয়ে দেওয়া হতো আলপনা সর্বত্র। গোয়াল ঘরও পরিষ্কার করা হতো ভালো ভাবে। গোরুর শিং ও পায়ে মাখানো হতো তেল। চর্চিত হতো তা সিঁদুরে। বস্তুত লক্ষ্মীপূজার সঙ্গেই এদিন পূজা করা হতো গো-ধন এবং চাষের জন্য প্রয়োজনীয় লাঙল-কোদাল ইত্যাদিও।

পৌষ পূর্ণিমায় আয়োজিত এই লক্ষ্মী পূজায় দেওয়া হয় নানা মরশুমি ফল। দেবীকে দেন পিঠে পায়েস ও অন্নভোগও। দিনটি বিশেষ করে গ্রামবাংলার জীবনে এক বিশেষ আনন্দ-উৎসবের বার্তা নিয়ে আসে। অনেকে এই দিনে নতুন পোশাকও পরে থাকেন।

বছরের বিভিন্ন মাসে বিশেষ ভাবে পূজিতা দেবী লক্ষ্মীর অর্চনার অন্যতম অঙ্গ পাঁচালি পাঠ। বাড়ির মহিলারাই পাঠ করেন পাঁচালি। কোথাও কোথাও অবশ্য পুরোহিতই শোনান তা। ধারণা, এই ভাবে পাঁচালি শ্রবণের মধ্য দিয়েই পাওয়া যায় ব্রতফল। এই প্রসঙ্গেই বছরের বিশেষ বিশেষ পূর্ণিমা তিথিতে দেবী লক্ষ্মীর এই আরাধনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে এক একটি কাহিনি। পৌষ-লক্ষ্মীর ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটে না তার।

পৌষ-লক্ষ্মীর ব্রতকথাটি বড়োই তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে দেবীর মহিমা এবং ব্যক্তিজীবনের নানা বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক কারণেই অনেক সময় অত্যন্ত আপনজনও পর হয়ে যান— ব্যবহার করেন অ-মানবের মতো। তারই বাস্তব আলেখ্য যেন এই ব্রত কথা। আবার সৎ ও সুন্দরের নীতিতে অবিচলিত থেকে, ভক্তি ও বিশ্বাসে একনিষ্ঠ থেকে দেবীপূজা করলে কীভাবে তাঁর কৃপা পাওয়া যায়, তারও ভক্তিনিষ্ঠ চিত্রায়ণ যেন এই ব্রতকথা। এই ব্রতকথার অপর বৈশিষ্ট্য এর মধ্য দিয়ে ঘোষিত হয়েছে একটি নীতি আদর্শের কথা। বলা হয়েছে, মানুষের সম্পর্কটা হলো আন্তরিক, ধন-সম্পদের নিরিখে সম্পর্ক গড়লে তাকে ঠকতেই হয়। দগ্ধ হতে হয় অনুশোচনায়। অবশ্য তারই মধ্য দিয়ে ঘটে হৃদয়ের পরিবর্তন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধনরত্ন নয় মর্যাদা দেওয়া উচিত মানবতাকেই। পাঁচালির প্রচলিত পথ ধরেই পৌষলক্ষ্মীর কথা-কাহিনি গড়ে উঠেছে। এক দেশে ছিল এক গরিব বামনি। পাঁচটি ছেলে আর একটি মেয়েকে নিয়ে সংসার। সন্তানদের মধ্যে সকলের বড়ো হলো মেয়েটি। ছোটো ছেলেটি যখন পেটে তখনই মারা যায় বামুন। ফলে অভাব হয় বামনির পরিবারের নিত্যদিনের সঙ্গী। কোনোদিন একবেলা ভাত জোটে, কোনোদিন জোটে না। প্রায়দিনই অভুক্ত থাকতে হয় বামনিকে।

নিজেদের এবং মায়ের এই কষ্ট দেখে মেয়েটিই একদিন বলে বামনিকে, মা, আমাদের মামা তো খুব বড়োলোক। বলো না তাঁকে, তিনি যদি কিছু সাহায্য করেন, তাহলে তো আমরা অন্তত দু'বেলা খেয়ে বাঁচতে পারি।

মেয়ের কথায় কোলের ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে বামনি একদিন হাজির হয় দাদার বাড়ি। দাদা তখন ঘরে ছিল না। বৌদির তো ননদকে দেখেই মুখখানা হাঁড়ি। বেজার মুখেই জিজ্ঞেস করেন, কী গো, কী মনে করে এখানে।

ননদ বলে তার দুঃখের কথা। শুনে বৌদি বলে, খুবই দুঃখের কথা শোনালে ঠাকুর-ঝি। তবে কথাটা কী জানো, তোমার দাদার অবস্থাও এখন খুব ভালো যাচ্ছে না। কিন্তু তোমাকেই বা ফেলি কী করে। তুমি তো আমার আপনজনই। তা এককাজ করো, তুমি বরং এসে আমার চালগুলো ঝেড়ে দিয়ে যাবে। খুদ কুঁড়ো যা হবে তা তুমিই নিও এখন। আর ঘর-সংসারের কাজগুলো করে দিও। আমি বরং তোমাকে কিছু চাল-তরকারি দেব।

রাজি হয় বামনি। যা হোক, কিছু তো মিলবে। তাতে ছেলে- মেয়েদের মুখে কিছু তো দেওয়া যাবে। এই রকম সাত-পাঁচ ভেবেই কাজে লেগে পড়ে বামনি। ওরই মধ্যে একদিন বাড়ির উঠোনে লকলকিয়ে ওঠা লাউগাছের কয়েকটি ডগা চাইল বামনি। শুনে বৌদি বলে, খবরদার একথাটা মনেও এনো না। তোমার দাদা শুনলে একবারে অনর্থ করবে।

ম্লান মুখে ফিরে যায় বামনি। কয়েকদিন পরেই পৌষলক্ষ্মীর পুজো। বৌদি সেদিন বামনিকে বলে, যদি আমার মাথার উকুনগুলো বেছে দাও তাহলে লুকিয়ে গোটাকয়েক লাউপাতা আমি তোমাকে দেব এখন।

বামনি বলে, আজ তো হবে না বৌদি। আজ লক্ষ্মীবার। উকুন মারতে নেই। তছাড়া সময়ও বেশি নেই। এই খুদগুলো নিয়ে ফুটিয়ে দেব, তারপর বাছারা কিছু খেতে পাবে। কাল থেকে সকলে আধপেটা খেয়ে আছে।

শুনেই বৌদি একবারে খড়্গহস্ত। বলে, তুমি তো বেশ, নিজের বেলা আঁটিশুটি পরের বেলা দাঁতকপাটি। নিজেরটা বোঝো, দাদার মঙ্গল অমঙ্গল বুঝবে না। লক্ষ্মীবারে খুদ নিয়ে যাচ্ছ! বলেই বামনির আঁচল থেকে কেড়ে নেয় তা।

কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির পথ ধরে বামনি। মনে মনে ঠিক করে, আর নয়। রাস্তায় যা নজরে পড়বে তাই নিয়ে যাব। যেতে যেতে দেখে পথের পাশে পড়ে রয়েছে একটি মরা গোখরো সাপ। বামনি মনে মনে বলে, যা থাকে কপালে। আজ এটাই রেঁধে খেয়ে মরবো সকলে। এই ভাবে সাপটি বাড়িতে এসে কেটেকুটে হাঁড়িতে জল দিয়ে সেদ্ধ করতে বসায়। আর তারপরই ঘটল এক অলৌকিক কাণ্ড।

বামনি উনুনে যত কাঠ দেয় ততই হাঁড়ি উথলে পড়তে থাকে সোনার ফেনা। একসময় ঘর ভরে যায় সোনার ফেনায়। বামনি খুরিতে করে একটু ফেনা তুলে ছেলেকে পাঠায় দোকানে তা বিক্রি করার জন্য।

সোনা বিক্রি করে অনেক টাকা পায় তারা। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। লক্ষ্মীর বার। বামনি তাই স্নান করে শুদ্ধ মনে আলপনা দিয়ে নতুন ধান দিয়ে বসায় লক্ষ্মীর ঘট। নানারকম উপচার দিয়ে ভক্তি ভরে পুজো করে লক্ষ্মীর। বারোটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে পাড়ায় বিলি করে প্রসাদ। তারপর ছেলে-মেয়েদের খাইয়ে প্রসাদ পায় নিজে।

সেই গোখরো সাপের ফেনায় এত সোনা হয়েছিল যে কিছুদিনের মধ্যে তা বিক্রি করে বামনি বানায় রাজবাড়ির মতো বড়ো বাড়ি। মেয়ের বিয়ে দেয় এক রাজপুত্রের সঙ্গে। ছেলেদের বিয়ে দিয়ে আনে ঘর-আলো করা বউ। বামনির বাড়িতে উথলে পড়ে লক্ষ্মীর শ্রী।

বামনি হীরে-মুক্তোর গয়নায় গা ভরিয়ে ছেলে-বৌদের নিয়ে পাল্কি করে হাজির হয় দাদার বাড়ি।

বৌদি তো তাড়াহুড়ো করে সকলকে আপ্যায়ন করে ভালো আসন পেতে ঝকঝকে নতুন বাসনে খেতে দেয় সকলকে। ছেলের বউরা আসনে না বসে তার ওপর রাখে তাদের গায়ের বেশ কিছু গয়না। তারপর ছড়া কেটে বলে,—

সোনাদানা হীরে মুক্তো ধন্য মান্যগণ্য।
যাদের কল্যাণে আজ মোদের নেমন্তন্ন।।

বৌদি কিন্তু বুঝতে না পেরে ননদকে বলে—, ভাই, বউরা না খেয়ে এসব কী বলছে?

বুঝতে পারলে না। ওরা বলছে, যখন আমাদের কিছু ছিল না তখন খোঁজ নেওয়া দূরে থাক, দু' মুঠো খুদও কেড়ে নিয়েছো। প্রাণে ধরে দুটো লাউ পাতাও দিতে পারোনি। আজ অবস্থা ফিরতেই শুরু করেছো তোয়াজ— আদরযত্ন। নেমন্তন্ন করেছো আমাদের নয় সোনাদানাকে। তাই ওরা একথা বলছে।

বৌদি এবার লজ্জা পায়। অনুতাপও হয়। ননদের হাত ধরে অনেক কাঁদাকাটা করে ক্ষমা চায়। বামনি কিছু না বলে বউদের নিয়ে বাড়ি চলে আসে। এই ভাবে অনেকদিন সুখে ঘরকন্না করে বামনি। বয়স হতে বৌদের পৌষ লক্ষ্মী পুজোর নিয়ম বলে। তারপর এক সময় স্বর্গে চলে যায়।

বৌ-রা তাদের শাশুড়ির মতো প্রতি বছর পৌষলক্ষ্মীর পুজো করতে থাকে। ক্রমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এই পুজো। পৌষলক্ষ্মী হয়ে ওঠেন সৌভাগ্যের ও সমৃদ্ধির প্রতীক।

পৌষের উৎসবের আঙিনায়

সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়

যদি প্রশ্ন করা হয়, এমন কোনও তিথি কি আছে, যে সময়ে সমগ্র ভারতের উৎসবমুখর মুখচ্ছবিটি ধরা পড়েছে প্রাচীন কাল থেকে, অবিকৃত ভাবে? এর উত্তর হবে একটাই— আর তা হলো পৌষের মাহেন্দ্রক্ষণ। পৌষ মাস বলতেই বাঙ্গালিরা এক কথায় পৌষপার্বণ আর পিঠেপুলির কথা বলেন। কেউ কেউ আর একটু সংস্কৃত প্রবণ হয়ে বলেন মকর সংক্রান্তির কথা, চলতি কথায় পৌষসংক্রান্তি। সংক্রান্তি অর্থাৎ শেষদিন— আসলে যা সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে যাওয়ার কাল। পৌষ শেষের এই কালপর্বে 'মকরস্নান' বা 'মকর ডুব'য়ের পবিত্র আচারটি ধর্মপ্রাণ হিন্দুর সর্বাগ্রে মনে আসে। কিন্তু শুধু মকর সংক্রান্তির ডুব স্নান নয়, সমগ্র পৌষ মাস জুড়েই বঙ্গদেশে বহু ধর্মীয় সামাজিক আচার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শুধু পশ্চিমবঙ্গের কথা বললে ভুল হবে, সারাদেশ জুড়েই এই সময়ের নানা ধর্মীয় সংস্কার ব্রতাচার পালিত হয়। এই সমস্ত আচার সংস্কারের শেকড় অত্যন্ত গভীর— একই সঙ্গে তা লৌকিক এবং শাস্ত্রীয়; দেশীয় এবং আঞ্চলিক। অঞ্চল ও গোষ্ঠীগত পার্থক্য থাকলেও, এদের মধ্যেকার মিলগুলিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

পৌষ মাসকে হিন্দু শাস্ত্রে অত্যন্ত পবিত্র গণ্য করা হয়। বলা হয়েছে, ধর্মীয় আচার পালনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রশস্ত এই মাস। ফলত, বিবাহ, গৃহনির্মাণ, সম্পদ সংগ্রহ ইত্যাদি ঐহিক ক্রিয়াকর্ম এই সময় অমঙ্গলকর। তাই নানান শুদ্ধ ধর্মাচার পালন করা এই সময়ে বিধেয়। প্রশ্ন হলো, এটি কি কেবল শাস্ত্রের বিধান; না কি বাস্তব নানা অনুষঙ্গ এমন একটি সময়ের জন্ম দিয়েছে? তা না হলে, এত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বর্ণ শ্রেণী নির্বিশেষে মানুষ কেন এত উৎসবমুখর হয়ে উঠল। কেনই বা মহাভারতের যুগ ও পরবর্তী ইতিহাসকালে সম্রাট অশোকের প্রস্তর লিপিতে উল্লেখ অর্জন করল এই সময় আর তার উৎসব। এখানে একটি বিশেষ কথা খেয়াল রাখা দরকার। ভারতের চান্দ্রমাস নির্ভর পঞ্জিকায় একমাত্র ব্যতিক্রম এই মকর সংক্রান্তি, যা চলে সৌর পঞ্জিকার নিয়মে। সূর্য এই সময় দক্ষিণায়ন ত্যাগ করে উত্তরায়ণে গমন করেন। এই গমন ধনুরাশি থেকে মকর রাশিতে— যে কারণে এর নাম মকর সংক্রান্তি; আর সৌর মাস ধনু চান্দ্রমাস পৌষের সমসাময়িক। তাই পৌষ মাসে এই গমন বা সংক্রান্তি হয় বলে তা পৌষ সংক্রান্তি। এই সময়ে শীতকালীন অয়নান্ত বিন্দুটিকে অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে দিন ক্রমশ বাড়তে থাকে। অর্থাৎ সূর্যের দাপট বাড়তে থাকে। বলা হয়, সূর্যের নবজন্ম হলো এই দিন থেকে। মকর সংক্রান্তির মধ্যে সূর্যের এই গুরুত্বের দিকটি, অন্য ভাবে বললে সূর্য-উপাসনার প্রতীকী তাৎপর্যটি ধরা রয়েছে। আধুনিক বাঙ্গালি পঞ্জিকা মতে, বৈশাখ মাসে কিংবা ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে বছর শুরু হলেও, বাংলার লৌকিক পরম্পরায় মকর সংক্রান্তির দিনটিই বছরের শেষ দিন। পরদিন অথাৎ পয়লা মাঘ থেকে নতুন বছর শুরু, যে কারণে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে বনবাসী জনজাতিদের মধ্যে দিনটি আখান দিন নামে পরিচিত। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, সূর্যের নবজন্ম, বছর শেষের সমস্ত গ্লানি পাপ ধুয়ে স্নানের মাধ্যমে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে ওঠা

কেবল মাত্র আচার সর্বস্ব নয়; কৃষি প্রধান দেশে সূর্য-কেন্দ্রিক জীবনযাপনের এক সুপ্ত ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে পুজা-পার্বণ-ব্রত-আচারগুলির মধ্যে।

সূর্যের অফুরন্ত দাক্ষিণ্য ছাড়া ফসলের প্রাচুর্য অকল্পনীয়। অঘ্রাণেই মূলত ফসল গোলায় উঠে যায়। পৌষ মাসে থাকে নিশ্চিন্ততা, শান্তি। যার আনুকূল্যে এই প্রাচুর্য লাভ, তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর আনন্দের কথা জানান দিতে হবে না? বঙ্গদেশে শ্রেণী বর্ণ গোষ্ঠী ভেদে নানা ভাবে তাই এই কৃতজ্ঞতার উদ্‌যাপন হয়। হিন্দুর গৃহে গৃহে হয় পৌষ লক্ষ্মীর আরাধনা। বাড়িতে বাড়িতে সশীষ ধানের খড় দিয়ে আউনি-বাউনি বাঁধা হয়। সেই সঙ্গে ছড়া কাটা হয় :

আউনি বাউনি
তিন দিন কোথা যাওনি।
পিঠে ভাত খেও
এক কোটি আছে, বাহান্ন কোটি হোক।

একটি ঘটিতে চাল নিয়ে, তাতে কাঁচা টাকা রাখা হয় তার উপর পান সুপুরি দিয়ে আউনি-বাউনি শুদ্ধ গোলায় রাখা হয়। একে গোলা পূজাও বলে। গোলার সামনে, বাড়ির দুয়ারে, উঠানে আলপনা দেওয়া হয়। নতুন চাল পুরোনো চাল মিশিয়ে রান্না করে খাওয়া হয়। এর পাশাপাশি নানা ধরনের পিঠে তৈরি করা হয়— তবে আবশ্যিক হলো আসকে পিঠে। চালের গুড়িকে মাটির পাত্রে ভাপিয়ে তৈরি করা। সরলতম উপায়ে রান্না কৌশল। আরও নানা রকমের পিঠে হয়। পুলি পিঠে, পাটিসাপটা, দুধপুলি, সরুচাকলি, ভাজাপুলি। এই পিঠে যেমন দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়, তেমনি পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধবের মধ্যেও আদান প্রদান হয়। কেবল তাই নয়, এই পিঠে দেওয়া হয় পশুপক্ষীকে, জলে এবং আগুনে। লোক বিশ্বাস এই যে, এই সময় পিঠে না খেলে 'পোষ বিড়ালি' হতে হয়। মকরসংক্রান্তির দিন নদী বা পুকুর ঘাটে গিয়ে ডুব স্নান করাও একটি আবশ্যিক আচার। স্নানের আগে মাথায় সরষে ফুল মুলো ফুল রাখার একটি সংস্কারও কোথাও কোথাও দেখা যায়। স্নান করে উঠে মেয়েরা 'মকর পাতাতো'— মকর পাতানো অর্থাৎ ফুল সই পাতানো। যেখানে দুই বন্ধু কোনও একটি ফুল নিজেদের মধ্যে বিনিময় করতো— চাঁপা বা গোলাপ ইত্যাদি ফুলের নামেই সেই থেকে তারা পরস্পরকে ডাকতো।

এই মকর পরবেই পালিত হয় দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের এক অতি জনপ্রিয় উৎসব টুসু। এই অঞ্চলের বনবাসী থেকে জাতিবর্ণের মানুষের অত্যন্ত প্রিয় উৎসব এই টুসু। কুর্মি-মাহাতো, বাউরি, বাগদি, ভূমিজ, বাগান বৈগা প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ই এই টুসু পরব পালন করে থাকেন। সমগ্র পৌষ মাস জুড়েই টুসু উপলক্ষ্যে নাচ গান করা হয়। তবে পৌষের শেষ তিন দিন উৎসবের মূল চমকটি থাকে। সংক্রান্তির আগের দিনকে বলে 'বাঁউনি' (কোথাও বাউরী); এদিন হাট থেকে টুসু মূর্তি বা চৌদশা কিনে আনা হয়। এদিন সারারাত বাড়ির ও পাড়ার মেয়েরা নাচ-গান করেন। রাতভর এই গান গাওয়াকে বলে 'জাগরণ'। টুসু মূর্তি বলতে নানা রকম দেখা যায়। কোথাও দ্বিভুজা লক্ষ্মীর মতো; কোথাও পুতুলের মতো, আবার দুটি গোবরের ছোটো ডেলাও টুসুর প্রতীক। মূলত পুরুলিয়া, সংলগ্ন পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম জুড়ে এই উৎসব পালিত হয়। ইদানীং হুগলী, নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে, যেখানে বনবাসী মানুষেরা পশ্চিম থেকে অভিবাসিত হয়ে এসেছেন, সেখানেও টুসু পরব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিরাট সমারোহ দেখা যাচ্ছে গত কয়েক বছর ধরে। যাই হোক, সংক্রান্তির আগের দিন, বাড়ির ধান রাখা হয় যেখানে, সেখানে টুসুর পুজো হয়। বাড়ির মেয়েরাই এই পুজো করে। চিড়া, গুড়, ছোলা, মুগ, নারকেল, বাদাম, কুল, ফল, মিষ্টি দিয়ে পুজো নিবেদন করা হয়। এর পর বাড়ির মেয়েরা টুসু গান করেন। গানে তাদের দৈনন্দিন জীবনের কথা, ভালোবাসা, দুঃখ, বেদনার কথা, সমসাময়িক ঘটনা সমস্ত কিছুই উঠে আসে। মৌখিক এই সৃষ্টি, প্রজন্ম পরম্পরায় বাহিত হয়ে চলেছে। গানের মধ্যে আসেন শ্রীকৃষ্ণ, রামসীতা, হনুমান। 'বৃহৎ' আর 'ক্ষুদ্র' ঐতিহ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আবহমানের ভারতবর্ষের ছবি উঠে আসে। টুসুকে বন্দনা করে গান হয় :

শখের ঘটি শখের বাটি
শখে দিব আলপনা,
দেখ টুসু তোর শখ রেখেছে
মেড়-এ রুপোর কারখানা।

এই টুসু কখনও বাড়ির মেয়ে, কখনও প্রেয়সী কিংবা বন্ধু। আবার টুসু রক্ষয়িত্রী, শস্যের দেবী, ধনধান্যের দেবী। সংক্রান্তির দিন টুসুর ভাসান বা বিসর্জন হয় স্থানীয় নদী বা বাঁধের জলে। শোভাযাত্রা করে, কাঁধে বা মাথায় করে দেবীকে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরুলিয়ায় চৌদশা সাজানো হয়। এই উপলক্ষ্যে বিরাট মেলাও বসে। এখানেও গান-নাচ হয়। মকর সংক্রান্তির দিন এই অঞ্চলগুলিতে স্নান করে তিলকুট বা তিল মিঠা খাওয়ার একটি প্রথা রয়েছে। সেই সঙ্গে অবশ্যই নানা রকমের পিঠা তৈরি করা হয়— পুর পিঠা, আসকে পিঠা, গোলা পিঠা, চারপা পিঠা, ছাকা পিঠা ইত্যাদি। এক বৃদ্ধ তার স্মৃতিচারণায় বলেন, আগে মকরেই নতুন জামাকাপড় হতো। দুর্গা পুজোয় নয়। মকর ডুব দিয়ে নতুন জামা পরে 'তিলমিঠা' খাওয়া হতো।

মকর স্নান, লক্ষ্মী পুজো বা টুসুই নয়; পৌষে সাঁওতালদের মধ্যে সাকরাত পরব অনুষ্ঠিত হয়। বাইগা-বাগলিরা টুসু ছাড়াও পৌষেই করেন পাহাড় পুজো। বস্তুত পৌষজুড়ে এভাবেই শাস্ত্রীয় ও লৌকিক আচার মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

পৌষসংক্রান্তির পিঠেপুলি

সুতপা বসাক ভড়

কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশে ধান মুখ্য ফসল তাই নতুন চাল পৌষ পার্বণের মুখ্য উপাদান। আমাদের দেশের সব প্রান্তে পৌষসংক্রান্তির দিন ভোরবেলা স্নান করে নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করে, নতুন চালের বিভিন্ন ব্যঞ্জন রান্না করে, ভগবানকে নিবেদন করার পর তার প্রসাদ পাওয়ার রীতি অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। কোথাও খিচুড়ি, কোথাও পায়েস, কোথাও বা আরও অনেকরকম নতুন চালের পদ। প্রকৃতির দান নতুন চালই হলো এই পার্বণের পূজ্য।

পশ্চিমবঙ্গে এই দিনটিতে বিভিন্ন রকমের মিষ্ঠান্ন, পিঠেপুলি বানানো হয়ে থাকে। ঘরে ঘরে নতুন চাল দিয়ে বিভিন্ন প্রকার পদ তৈরি করা হয়। নানান রকমের পদ হলেও এর জন্য প্রয়োজন কিছু ঘরোয়া জিনিস যেমন—নতুন চাল, নতুন চালের গুঁড়ো, নারকেল, নতুন খেজুর গুড়, দুধ, চিনি, সামান্য ময়দা, জল। বর্তমানে টেলিভিশনের পর্দায় রান্নার যেসব 'শো' প্রদর্শিত হয়, তার সঙ্গে এইসব পরম্পরাগত রান্নার উপাদান, পদ্ধতি, স্বাদ, স্বাস্থ্য ও অর্থব্যয় কোনোটাই তুলনা করা যায় না। এক কথায় অতুলনীয় এই ঘরোয়া পদগুলি। সব বয়সেই মানুষেরাই পছন্দ করেন পিঠে-পুলি-পায়েস। অনেকরকমের কিছু হলো— আস্‌কে পিঠে বা সরা পিঠে, পুলি পিঠে, দুধ-পুলি, পাটিসাপ্‌টা, নতুন চালের পায়েস, চোহি বা চুষির পায়েস ইত্যাদি। এছাড়া নতুন ফসল রাঙা আলুর বড়াও বানানো হয়ে থাকে এই সময়।

প্রথমে আসি,আস্‌কে পিঠে বা সরা পিঠে প্রসঙ্গে। এর জন্য প্রয়োজন ঢাকনা সমেত মাটির সরা। এছাড়া চাই বেগুনের বোঁটা। একটি পাত্রে নতুন আতপ চালের গুঁড়ো, নারকেল কোরা, সামান্য নুন এবং জল দিয়ে মাঝারি ঘোল বানাতে হবে। এবার মাটির সরা এবং ঢাকাটি কাপড় দিয়ে ভালো করে মুছে নিতে হবে। এখন গ্যাসে কম আঁচে মাটির সরাটি বসিয়ে বেগুন বোঁটাতে সামান্য তেল নিয়ে তা সরার ভেতর দিকে লাগিয়ে তাতে একহাতা চাল গোলা দিতে হবে। এরপর ঢাকা দিয়ে, সেই ঢাকার চারপাশে সামান্য জল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিতে হবে। ওই জল বুদ্‌বুদ্‌ হয় শুকিয়ে গেলে ঢাকা সরিয়ে আস্তে করে আস্‌কে পিঠে বা সরা পিঠে তুলে নিতে হবে, যা দেখতে অনেকটা ইডলির মতো। নতুন খেজুরের ঝোলা গুড়ের সঙ্গে খুবই উপাদেয় এই পিঠে। সাধারণত গৃহস্থ বাড়িতে এই পিঠে দিয়েই ওইদিন পিঠে বানানো শুরু হয় এবং প্রথম বানানো পিঠেটি অগ্নিদেবতাকে নিবেদন করা হয়।

দ্বিতীয় বা তার পরের তৈরি পিঠেগুলি প্রসাদ হিসাবে খাওয়া হয়। ব্যবহারের পরে ওই মাটির সরা এবং ঢাকনা বাড়িতে ভালোভাবে রাখা থাকে। আগামী বছর নতুন সরা এলে, তখন ওই পুরানো সরা ফেলে দিতে হয়।

পুলিপিঠের জন্য প্রয়োজন নতুন চালের গুঁড়ো, সামান্য নুন, নারকেল এবং নতুন খেজুর গুড়। প্রথমে নারকেল কুরিয়ে গুড় দিয়ে মেখে কড়াইতে জ্বাল দিয়ে নাড়াচাড়া করে নারকেলের 'ছেই' বানাতে হবে। অনেকে এতে ক্ষীরও দিয়ে থাকেন। এবার চালের গুঁড়োতে সামান্য নুন মিশিয়ে অল্প অল্প করে গরম জলে রুটির আটার মতো মেখে 'খোলা নামতে' হবে। বেশ নরম মাখা হলে গরম অবস্থাতেই গোল করে নারকোলের ছেইয়ের পুর দিয়ে পুলির আকার দিয়ে ধারগুলি ভালো করে বন্ধ করে, পুলির গায়ে হাল্কা তেল লাগিয়ে ভাপে বসাতে হবে। আগে হাঁড়িতে জল ফোটাতে দিয়ে তার ওপর কাপড় বেঁধে পুলি সাজিয়ে দিয়ে কম আঁচে ১৫ মিনিট রাখলেই সুস্বাদু পুলিপিঠে তৈরি।

দুধপুলি বানানোর জন্য পুলি ভাপে সেদ্ধ না করে ফুটন্ত দুধের আঁচ কমিয়ে সামান্য চিনি দিয়ে আধঘণ্টা মতো ফোটাতে হবে। এরপর ঠাণ্ডা হলে নতুন গুড় ভালভাবে মিশিয়ে নিলে তৈরি দুধপুলি।

পাটি সাপ্‌টার জন্য আগে থেকে অল্প চিনি জলে গুলে নিতে হবে। নতুন চালগুড়ি এবং চিনি গোলা জলের মিশ্রণ বানিয়ে রাখতে হবে। এবার কম আঁচে চাটু রেখে বেগুন বোঁটায় করে সামান্য সাদা তেল চাটুতে লাগাতে হবে। এরপর গোলা ছড়িয়ে দিয়ে গোলাকার হলে, তার একদিকে 'নারকেলের ছেই দিয়ে খুন্তির সাহায্যে গোল করে ঘুরিয়ে পাটিসাপ্‌টার আকার দিতে হবে। উপাদেয় এবং ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি পিঠেগুলি সত্যিই অনবদ্য।

পায়েস বানাবার জন্য প্রয়োজন দুধ, নতুন গোবিন্দভোগ চাল, চিনি ও গুড়। দুধ ফুটে উঠলে তাতে পরিমাণমতো চাল (সাধারণত একলিটার দুধে ৫০ গ্রাম চাল) দিয়ে কম আঁচে বসিয়ে, মাঝে মাঝে নেড়ে দিতে হবে। চাল সেদ্ধ হলে তাতে চিনি দিয়ে ফোটাতে হবে। ঠাণ্ডা হলে তাতে নতুন খেজুর গুড় মিশিয়ে দিতে হবে। ■

জগজ্জননী মা সারদা জন্মোৎসব সমিতির চেতনাযাত্রা

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি দক্ষিণবঙ্গের পরিচালনায় 'জগজ্জননী মা সারদা জন্মোৎসব সমিতি'র উদ্যোগে গত ২৯ ডিসেম্বর চেতনা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সকাল ১১টায় স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা উত্তর

কলকাতার রাজপথ পরিক্রমা করে বাগবাজার মায়ের বাড়ি পৌঁছয়। শোভাযাত্রায় মা সারদার প্রতিকৃতি-সহ ট্যাবলো, সমিতির সেবিকাদের ঘোষবাদ্য এবং স্বামীজী ও মা সারদার সাজে শিশুরা শোভাযাত্রাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। শোভাযাত্রায় ৪০০ মা-বোন অংশগ্রহণ করেন। শোভাযাত্রা শেষে মায়ের বাড়িতে সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে সভানেত্রী হিসেবে পূজ্যা আত্মাস্থানন্দময়ী মা এবং বিশেষ অতিথিরূপে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ সুনীতা হলদেকর উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া শ্রীমতী মহুয়া ধর, শ্রীমতী মায়া মিত্র, শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়, শ্রীমতী মৌসুমি কর্মকার সহ স্বাগত সমিতির কার্যকর্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

শিলিগুড়িতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হিন্দু সম্মেলন

গত ৩০ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি শহরের ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সম্পাদক ধর্মনারায়ণজী এবং অযোধ্যা থেকে আগত গোরক্ষা

পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি আনন্দপুরী মহারাজ। সভায় ধর্মনারায়ণজী ভারতে বিদেশি আক্রমণকরীদের দ্বারা হাজার হাজার মন্দির ধ্বংসের নিন্দা করে অবিলম্বে অযোধ্যার শ্রীরাম জন্মভূমি, মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান এবং কাশী বিশ্বনাথ মন্দির নিঃশর্তে হিন্দুদের হাতে সমর্পণের দাবি জানান। তিনি বলেন, রামজন্মস্থানের ভূগর্ভে প্রাচীন মন্দিরের কাঠামো পাওয়া গিয়েছে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চ মন্দিরের পক্ষেই রায় দিয়েছে। এখন সর্বোচ্চ আদালত টালবাহানা করছে। তাই সরকারকেই মন্দিরের জন্য আইন প্রণয়ন করে হিন্দুসমাজের মনোভাবনাকে মর্যাদা দিতে হবে।

সভায় প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে পাঁচহাজারের বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন সুশীল রামপুরিয়া এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সভাপতি সুদীপ্ত মজুমদার।

কালিয়াগঞ্জে পরিবার প্রবোধনের সভা

গত ৩০ ডিসেম্বর রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উদ্যোগে উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ শহরে পরিবার প্রবোধনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার ৮ স্থান থেকে ৪১০ জন মা-বোন অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ সুনীতা হলদেকর এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত পরিবার প্রবোধন প্রমুখ মুটুকেশ্বর পাল।

বদলপুরে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সংকল্প দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৫ রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উদ্যোগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বদলপুরে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরু ভাইদের সংকল্প দিবস উপলক্ষ্যে বনভোজনের আয়োজন করা হয়। তাতে ৪১ জন সেবিকা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন সমিতির উত্তরবঙ্গ সম্ভাগ কার্যবাহিকা শ্রীমতী গরিমা বেঙ্গানী।

স্বামীজী গীতাপাঠের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ফুটবল খেলার কথা বলেছেন

ড. রাকেশ দাশ

হিন্দু দর্শন ও ঐতিহ্যের বিকৃত উপস্থাপন ভারতবর্ষের একটি ভয়ানক ব্যাধি। প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থ সমূহ, হিন্দু সমাজে প্রচলিত বিবিধ প্রথা ও ঐতিহ্যগুলিকে দু'ভাবে বিকৃত করা হয়। কোথাও কোনও দার্শনিক মতের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে হিন্দুত্বকে বদনাম করার প্রচেষ্টা হয়, কোথাও বা কোনও মতকে অন্যথা ব্যাখ্যা করে হিন্দু সমাজের মধ্যে নপুংসকতা, নিরাশা প্রসারের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

প্রাচীন গ্রন্থগুলিকে নিয়ে যেমন এই অপচেষ্টা চলেছে একই রকম ভাবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থগুলির উপরেও এই পদ্ধতির প্রয়োগ হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে বহুমুখী অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য আক্রমণে জর্জরিত হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি এবং তাঁর পার্ষদগণ হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির সমাধানে যেমন সচেষ্ট হয়েছিলেন তেমনই হিন্দু সমাজ ও দর্শনের উপর আগত বাহ্য আক্রমণগুলিকে প্রতিহত করার বিষয়ে বিশেষ উপক্রম নিয়েছিলেন।

তৎকালীন বাঙ্গালি হিন্দু সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বিপুল প্রভাবের কারণে অভারতীয় বিচারধারাগুলির প্রসারের গতি রুদ্ধ হয়। স্বাভাবিক কারণে সেই সমস্ত মহল থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তাকে কমানোর যৎপরোনাস্তি প্রচেষ্টা শুরু হয়। একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্র হননের প্রচেষ্টাও চলতে থাকে। জেফরি কৃপালের মতো লোকেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে দুশ্চরিত্র, লম্পট বলে প্রমাণ করারও যথেষ্ট প্রয়াস করেছেন। আবার কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণকে যীশুর অবতার বলে প্রচার করারও প্রবল প্রচেষ্টা করেছিলেন।

এই দ্বিতীয় ধারার প্রচারকরা স্বামীজী এবং ঠাকুরের জীবনের বিবিধ ঘটনা এবং বাণীর অপব্যাখ্যার মাধ্যমে হিন্দু সমাজের বিঘটনের যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন এবং করছেন। ঠাকুরের 'যত মত তত পথ' কথাটিকে বিকৃত উপস্থাপনের মাধ্যমে হিন্দু সমাজে আত্মবিস্মৃতির পথ প্রশস্ত করা হয়েছে। এটি করতে গিয়ে এমন অসত্যকেও সাড়ম্বরে প্রচার করা হয়েছে যে, ঠাকুর ইসলাম ও খ্রিস্ট মতে 'সাধনা' করেছিলেন।

স্বামীজীর বাণী ও রচনার বহু অংশকে এরকমভাবেই অসংলগ্ন ও সন্দর্ভ বহির্ভূত ভাবে তুলে এনে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে হিন্দু সমাজে ভ্রান্তির প্রচার করা হয়েছে। এমনই একটি বিখ্যাত উক্তি— 'গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা ভালো'।

প্রায়শ বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তৃতার মঞ্চে, খেলাধুলার আসরে এই কথাটিকে হুবহু এরকম ভাবেই উদ্ধৃত করা হয়। তাছাড়াও, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রসঙ্গ এলেও এই কথাটিকে উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে। অনেকে ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে, যিনি এই কথাটি বলছেন তিনি বিশ্বাস করেন যে, স্বামীজী এই কথাটি বলেছিলেন। কিন্তু কোথায় বলেছিলেন বা আদৌ বলেছিলেন কিনা সেটি তিনি কখনও পরীক্ষা করার প্রচেষ্টা করেননি।

তথ্যগত ভাবে দেখতে গেলে স্বামীজী কখনওই এমন কোনও উক্তি করেননি। স্পষ্ট করে বলতে গেলে স্বামীজী কখনও বলেননি যে, 'গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা ভালো।' স্বামীজীর সমগোত্রীয় উক্তিটি হলো, ''গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে।''

উক্তিটি স্বামীজীর একটি তুলনামূলক কম প্রসিদ্ধ ভাষণগুলির একটিতে পাওয়া যায়। শিকাগো ধর্ম মহাসভার পরে আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করে ভারতে ফিরে আসার পরে বিভিন্ন স্থানে স্বামীজীকে যে সমস্ত সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল সেই সমস্ত স্থানে স্বামীজী উপস্থিত জনতার উদ্দেশে কয়েকটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণগুলি জে.জে. গুডউইন সাহেব কর্তৃক শর্টহ্যান্ড পদ্ধতিতে লিখিত হয়ে সংরক্ষিত হয় এবং পরবর্তীকালে 'Lectures from Colombo to Almora' নামে সংকলিত হয়। এর বাংলা সংস্করণটি 'আমার ভারত' নামে সংকলিত।

সেই বক্তৃতামালার দ্বাদশ বক্তৃতাটি 'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা' শীর্ষকে সংকলিত হয়েছে। এটি মাদ্রাজে (অধুনা চেন্নাই) প্রদত্ত ভাষণগুলির মধ্যে তৃতীয় ভাষণ। ভাষণের বিষয় বেদান্ত। ভাষণটিতে মাঝামাঝি জায়গায় স্বামীজী এই কথাটি উপস্থাপনা করেন। বক্তৃতার শ্রোতা কারা ছিলেন তা বলা কঠিন। তবে ভাষণের বিষয়বস্তু এবং ভাষা থেকে মনে হয় যে, স্বামীজী বেদান্ত দর্শন সম্পর্কে ধারণাসম্পন্ন যুবকদের সামনে ভাষণটি করেছেন।

এই বাক্যটি স্বামীজী যে প্রসঙ্গে বলেছেন সেটি এরকম, ''শত শত শতাব্দী যাবৎ এই লইয়া বিবাদ করিতেছি, তিলক ধারণ এইভাবে

করিতে হইতে কী ওই ভাবে। কোনও মানুষের দৃষ্টিতে আমার খাওয়া নষ্ট হইবে কিনা, এই ধরনের গুরুতর সমস্যার উপর বড়ো বড়ো বই লিখিতেছি। যে জাতির মস্তিষ্কের সমুদয় শক্তি এইরূপ অপূর্ব সুন্দর সুন্দর সমস্যার গবেষণায় নিযুক্ত, সে জাতির নিকট হইতে বড়ো রকমের একটা কিছু আশা করা যায় না, এরূপ আচরণে আমাদের লজ্জাও হয় না! হাঁ, কখনও কখনও লজ্জা হয় বটে, কিন্তু আমরা যাহা ভাবি তাহা করিতে পারি না। আমরা ভাবি অনেক জিনিস, কিন্তু কাজে পরিণত করি না। এইরূপে তোতাপাখির মতো কথা বলা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়েছে— আচরণে আমরা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ কী? শারীরিক দুর্বলতাই ইহার কারণ। দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না; আমাদিগকে সবলমস্তিষ্ক হইতে হইবে— আমাদের যুবকগণকে প্রথমত সবল হইতে হইবে, ধর্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও— তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমার স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে। আমাকে অতি সাহসপূর্বক একথাগুলি বলিতে হইতেছে; কিন্তু না বলিলেই নয়। আমি তোমাদিগকে ভালোবাসি। আমি জানি, পায়ে কোথায় কাঁটা বিঁধিতেছে। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমার গীতা আরও ভালো বুঝিতে পারিবে। যখন তোমাদের শরীর তোমাদের পায়ের উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইবে, যখন তোমার নিজেদের মানুষ বলিয়া অনুভব করিবে, তখনই তোমরা উপনিষদ্ ও আত্মার মহিমা ভালো করিয়া বুঝিবে। এইরূপে বেদান্ত আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে। অনেক সময় লোকে আমার অদ্বৈতমত-প্রচারে বিরক্ত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ বা অন্য কোনও বাদ প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমাদের এখন কেবল আবশ্যক— আত্মার এই অপূর্ব তত্ত্ব— অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য, অনন্ত শুদ্ধত্ব ও অনন্ত পূর্ণতার তত্ত্ব অবগত হওয়া।"

স্পষ্টত স্বামীজী এখানে হিন্দু সমাজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ক্লীবতা এবং তার থেকে উদ্ভূত দোষগুলির নিবারণের কথা বলেছেন। গীতাকে হীন প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই বাক্যটির প্রয়োগ নয়। স্বামীজীর অনেক ভাষণের মতো এই ভাষণটিও স্বয়ংসম্পূর্ণ। স্বামীজী ভারতবর্ষকে তার প্রাচীন দর্শনের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই ভাষণটি করেছিলেন। ভারতবর্ষে সমস্ত সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থারই মূল বেদান্ত দর্শন কিংবা বৈদিক দর্শন। বর্তমান যুগে বেদান্ত ভারতবর্ষের সমাজে কেন অপরিহার্য সেটাই স্বামীজী এই ভাষণে প্রতিপাদন করতে চেয়েছিলেন। ভাষণের প্রথমাংশে বেদান্ত দর্শনের সামান্য পরিচয় দিয়ে স্বামীজী তার প্রায়োগিক দিকটির কথা তুলে ধরেছেন। সেই প্রসঙ্গেই উক্ত বাক্যটির অবতারণা। আধ্যাত্মিকতায় যে সমাজ-বিমুখতা, ক্লীবতা, দুর্বলতার কোনও স্থান নেই সেই কথাটিই স্বামীজী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই ভাষণে পুনঃপুনঃ এনেছেন।

হিন্দু সমাজে পরিব্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ বৈষম্যগুলির কারণ যে কেবল দুর্বলতা সেটা স্পষ্ট ভাষাতেই স্বামীজী বলেছেন। প্রত্যেক হিন্দুকে বিশ্বাস করতে হবে যে, সে সমস্ত শক্তির আধার— অসীম শক্তিধর।

দুর্বল ব্যক্তি যখন শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় তখন সে শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা ছাড়া কিছুই করতে পারে না। সেজন্যই স্বামীজী গীতাপাঠের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ফুটবল খেলার কথা বলেছেন। স্বামীজী বলছেন, ''তোমরা কি দেখিতেছ না, ইংরেজ নর-নারী যখন আমাদের ধর্মতত্ত্ব একটু-আধটু বুঝিতে পারে, তখন তাহারা যেন উহাতে মাতিয়া উঠে, আর যদিও তাহারা রাজার জাতি, তথাপি স্বদেশের লোকের উপহাস ও বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া ভারতে আমাদের ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া থাকে? তোমাদের মধ্যে কয়জন এরূপ করিতে পারো? এই কথাটি কেবল ভাবিয়া দেখ। আর করিতে পার না, কেন? তোমরা কি জান না বলিয়া করিতে পার না? —তাহা নয়, তাহাদের অপেক্ষা তোমরা বেশি জানো, তাই তোমরা কাজ করিতে পার না। যতটা জানিলে তোমাদের পক্ষে কল্যাণ, তোমরা তাহা অপেক্ষা বেশি জানো— ইহাই তোমাদের মুশকিল। তোমাদের রক্ত পাতলা, তোমাদের মস্তিষ্ক আবিলতাপূর্ণ ও অসাড়, তোমাদের শরীর দুর্বল। শরীরের এ অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইবে। শারীরিক দৌর্বল্যই সকল অনিষ্টের মূল, আর কিছু নহে। গত কয়েক শত বৎসর যাবৎ তোমরা নানাবিধ সংস্কার, আদর্শ প্রভৃতির কথা কহিয়াছ, কিন্তু কাজের সময় আর তোমাদের সন্ধান পাওয়া যায় না।"

আজও দেখা যায় যে, দুই অক্ষর সংস্কৃত পড়তে না পারা ব্যক্তিও অত্যন্ত বিজ্ঞের মতো শাস্ত্রের বাণী আউড়ে প্রাচীন প্রথা, ঐতিহ্য এবং রীতিগুলির সমালোচনা করে। তাদের মধ্যে জ্ঞানের তৃষ্ণা বিন্দুমাত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজের রীতি এবং ঐতিহ্যের নেতিবাচক সমালোচনা করে তার মাধ্যমে নিজেকে উদারমনস্ক বলে প্রতিপাদন করাই যেন তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে প্রতীত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই কোনও কাজের সময় তাদের আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

যে জাতিগত সামাজিক বৈষম্য রূপ ব্যাধিতে হিন্দু সমাজ সর্বাপেক্ষা অধিক পীড়িত সেটির নিবারণের জন্যও বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ এগিয়ে এসে কিছু প্রয়োগও করেছেন, কিন্তু এখনও সেই সমস্যার সমাধান যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছে বলে মনে হয় না। স্বামীজী এই সমস্যার মূল রূপে চিহ্নিত করেছেন দুর্বলতাকে। স্বামীজীর কথায়, দুর্বল ব্যক্তিই অপরকে দমন করে এবং অপরের দ্বারা দমিত হয়। যিনি আত্মসচেতন এবং নিজ শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তিনি অপরকে দমন করার কথাও ভাবেন না, অপরের দ্বারা দমিত হওয়ার কথাও ভাবেন না।

সুতরাং বক্তৃতাটির মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় সবলতা সম্পাদন। সবল সমাজ যখন গীতার অধ্যয়ন করবে তখনই তার যথাযথ অর্থ অনুধাবন করতে পারবে। সমাজে পরিব্যাপ্ত ক্লীবতা ও নপুংসকতার কারণেই শাস্ত্রগুলির অপব্যাখ্যা হয়েছে। বর্তমানেও নিজেদের গীতা অধ্যয়নের অপারগতাকে ঢাকার প্রচেষ্টায় স্বামীজীর কথাগুলিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করার পরম্পরা চলছে। হিন্দুদের এই ক্লীবতা পরিত্যাগ করতে হবে। অন্যথা মানব সভ্যতার সামনে সমূহ বিপদ। হিন্দুত্ব যদি এই ক্লীবতার শিকার হয় তবে জগতের পরিত্রাণের উপায় নেই। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা দুর্বলের পক্ষে উপকারী। ফুটবল খেলার মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে গীতার অধ্যয়ন, অনুধাবন এবং প্রচারের মাধ্যমেই যথার্থ মানব কল্যাণ হতে পারে। এটিই স্বামীজীর আসল বক্তব্য।

(লেখক রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক)

যুগ যুগ ধরে গঙ্গাসাগর মানুষের মুক্তির দ্বার

গোবিন্দ চক্রবর্তী

বঙ্গাব্দ ১৪২৫-এর ৩০ পৌষ, ইংরেজির ২০১৯-এর ১৫ জানুয়ারি। মঙ্গলবার নবমী তিথিতে সূর্যের দক্ষিণায়নের শেষ দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ মহকুমায় গঙ্গানদী এবং বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ স্নান পর্ব। এবারের অমৃত যোগ সকাল ০৭.০৬ থেকে ০৭.৪৯ মিনিট পর্যন্ত, আর শাহি স্নান হবে বেলা ১১-৪৭ মিনিট।

গঙ্গাসাগর জনসমক্ষে এল কবে? সহস্রাধিক বছরের তীর্থক্ষেত্রটির সূত্রপাতের সঠিক ক্ষণ অজানা। ভারতের সহস্রাধিক তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে একমাত্র গঙ্গাসাগর তীর্থক্ষেত্রটি মূল ভূখণ্ডের বাইরে।

পৌষ সংক্রান্তির দিন সাগরসঙ্গমে স্নান করলে মুক্তি লাভ হয়। এই বিশ্বাস থেকে পৌষ সংক্রান্তির দিন দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী অনেক কষ্ট স্বীকার করে গঙ্গাসাগরে আসেন স্নান করতে।

কেউ কেউ বলেন ওয়েলেসলির (১৭৯৮-১৮০৫) শাসনকালে জীবন্ত ২৩টি শিশুকে জলে বিসর্জন দেওয়ার ঘটনা থেকে গঙ্গাসাগর জনসমক্ষে আসে।

মনে হয় এরকম কোনও একটি ঘটনার পর তীর্থস্থানটি সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার দাবি ওঠে। ওই দাবি রূপায়ণে এগিয়ে আসেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ সুধী জনেরা। গঠিত হয় 'সাগর আইল্যান্ড সোসাইটি'। তারপর মেলা পরিচালনার ভার নেয় জেলা ইউনিয়ন বোর্ড। সময়ের দাবি মেনে ১৯৬৪ সালে রাজ্য সরকার সরাসরি তীর্থক্ষেত্রটি পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। প্রাচীন এই তীর্থক্ষেত্রটি জাতীয় মেলার তালিকা ভুক্ত হওয়া উচিত বলে মনে করেন অনেকে।

ইউনিয়ন বোর্ডের সময় তীর্থযাত্রীদের মাথাপিছু দু' আনা কর দিতে হতো। পরে তা বেড়ে হয় চার আনা। রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর কর ধার্য হয় দু' টাকা পরে তা বেড়ে হয় পাঁচ টাকা। এই কর আদায়ে বিস্তর অভিযোগ ছিল। অবশেষে রাজ্য সরকার তীর্থ কর প্রত্যাহার করে।

প্রশাসনিক অসুবিধা দেখা দেওয়ায় ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম বছর গঙ্গাসাগরে স্নান পর্ব বন্ধ ছিল।

গঙ্গাসাগর জনসমক্ষে আসার সময় থেকে তীর্থযাত্রীদের সাহায্য ও সহযোগিতায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবী

সংগঠনের সংখ্যা শতাধিক। সময় হয়েছে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলির কাজের একটি জরুরি মূল্যায়নের।

সড়ক পথে অথবা ট্রেনে মূল ভূখণ্ড পর্যন্ত এসে, তারপর মুড়িগঙ্গা অথবা হাতানিয়া-দোয়ানিয়া যে কোনও একটি নদী পার হয়ে গঙ্গাসাগরে পৌঁছতে হয়।

বর্তমানে চিন্তার কারণ হলো দুই দিকের দুইটি নদীতে ব্যাপক চড়া পড়ছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে পলি কেটেও নদী পারাপার সচল রাখা যাচ্ছে না। নদী পারাপারের ক্ষেত্রে ভরসা জোয়ার। জোয়ারের সময় হলো— ১৩.১.২০১৯ রাত্রি ১-৪০ এবং বেলা ২-০৪ মিনিট, ১৪.১.২০১৯ রাত ২-২ এবং বেলা ২-৫৩ মিনিট, ১৫.১.২০১৯ রাত ৩-১৬ এবং বিকাল ৪-০৩ মিনিট, ১৬.১.২০১৯ ভোর ৪-৩২ এবং বিকাল ৫-৩১ মিনিট।

সড়ক পথের যে যাত্রীরা মুড়িগঙ্গা পার হবেন, তাদের লট-৮ ফেরিঘাটে আসতে হবে, সেখান থেকে নদী পার হয়ে কচুবেড়িয়া, ওখান থেকে সঙ্গমস্থলে। শিয়ালদহ-নামখানা ট্রেনের যাত্রীদের কাকদ্বীপ স্টেশনে নামতে হবে, স্টেশন থেকে লট-৮। তারপর নদী পার হয়ে কচুবেড়িয়া হয়ে স্নান ঘাটে।

যারা হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী পার হয়ে যেতে চান, সেই সড়ক এবং ট্রেন যাত্রীদের সরাসরি নামখানা যেতে হবে। এখান থেকে নদী পার হয়ে, বেণুবন অথবা চেমাগুড়ি, সেখান থেকে কপিলমুনির মন্দির।

এক সময় গঙ্গাসাগর যাওয়ার প্রধান দুয়ার ছিল নামখানা। যাত্রীদের চাপ কমাতে বিকল্প পথের ভাবনা শুরু হয়। ওই ভাবনায় ফসল মুড়িগঙ্গার মূল ভূখণ্ডের তীরে লট-৮ ওপারে কচুবেড়িয়া ফেরিঘাট তৈরি হয়। ১৯৯৪ সালে চেমাগুড়ির কাছে অভয়া লঞ্চ শতাধিক যাত্রীসমেত ডুবে যায়। তারপর থেকে গঙ্গাসাগর যাওয়ার ভারকেন্দ্র লট-৮ ফেরিঘাট।

আগে গঙ্গাসাগর মেলা শুরুর সময় আলোকিত হতো কেরোসিনের লণ্ঠনে, তারপর এল হ্যাজাক, এরপর জেনারেটর। সত্তর দশকে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ রুদ্রনগরে বিদ্যুতের পাওয়ার স্টেশন গড়ে তোলে। সময়ের দাবি মেনে ২০০৯ সালে মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর দিয়ে তার টেনে গঙ্গাসাগরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়, সমাপ্তি ঘটে ২০১১ সালে।

প্রাচীনকালে ভারতের রাজারা নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন। নিরানব্বইটি যজ্ঞ করার পর এই যজ্ঞ করা যেত। কালো রংয়ের একটি স্বাস্থ্যবান ঘোড়ার কপালে রাজার নাম লিখে সঙ্গে রক্ষক দিয়ে ঘোড়াটিকে ছেড়ে দেওয়া হতো। এক বছরকাল ঘোড়াটি নানা জায়গা ঘুরে ফিরে এলে শুরু হতো যজ্ঞ। তারপর যজ্ঞে পূর্ণ আহুতি দিলে রাজচক্রবর্তী সম্রাট হতেন।

অযোধ্যার ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা সগর এই অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং যজ্ঞ সফল করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সগরের এই সিদ্ধান্তে ইন্দ্র অখুশি হন এবং এই যজ্ঞ পণ্ড করতে রক্ষীদের বোকা বানিয়ে ঘোড়াটি চুরি করে গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির অজান্তে তাঁর আশ্রমে রেখে আসেন।

ঘোড়া রক্ষীদের হুঁশ ফিরতেই তারা ঘোড়ার খোঁজ শুরু করে। অনেক খোঁজাখুজির পর কপিল মুনির আশ্রমে ঘোড়াটি পাওয়া যায়। রক্ষী ও রাজকুমারদের ধারণা হয়, মুনি ঘোড়া চুরি করেছে। তারা মুনির সঙ্গে কথা না বলেই ঘোড়া উদ্ধারের নিমিত্তে মুনিকে আক্রমণ করে। কিন্তু মুনির সমর কৌশলে ঘোড়ারক্ষীরা পরাজিত ও নিহত হন।

সময় সমাগত কিন্তু রাজা ঘোড়ার অবস্থানের হদিশ না পাওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়েন। ঘোড়া সন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয় অংশুমানকে। অংশুমান জানতে পারেন ঘোড়া কপিল মুনির আশ্রমে আছে। আশ্রমে উপস্থিত হয়ে অংশুমান মুনির কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা জানতে পারেন। অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান কপিল মুনির কাছে মৃত ভক্তদের মুক্তির উপায় জানতে চাইলে মুনি জানান হিমালয় থেকে গঙ্গাকে নিয়ে এসে সাগরসঙ্গমে স্নান করলেই মুক্তি ঘটবে।

মৃত ব্যক্তিদের মুক্ত করতে গঙ্গাকে আনতে প্রথমে রাজা সগর, পরপর ক্রমান্বয়ে অসমঞ্জ, অংশুমান, দিলীপ চেষ্টা করেও সফল হলেন না। অবশেষে দিলীপের পুত্র ভগীরথ গঙ্গাকে ভূতলে আনতে সক্ষম হন। শাপগ্রস্তরা গঙ্গাবিধৌত হয়ে মুক্তি লাভ করেন। গঙ্গাসাগরের স্নান পর্বের এ হলো অমর কাহিনি।

এক সময়ের দুর্গমতম গঙ্গাসাগরের সঙ্গে এখনকার গঙ্গাসাগরকে কোনও দিক থেকেই মেলানো যাবে না। একটু একটু করে তীর্থক্ষেত্রে যাতায়াতের জন্য তৈরি হয়েছে পাকা রাস্তা, ব্যবস্থা করা হয়েছে পানীয় জল। বিদ্যুৎ, চিকিৎসা ও পরিবহণ। আগুন প্রতিহত করতে রাখা হচ্ছে দমকলের গাড়ি। উন্নত করা হয়েছে যোগাযোগের ব্যবস্থাও, শক্তপোক্ত করা হয়েছে বাঁশের বেড়া, ওয়াচ টাওয়ার এবং ড্রপ গেট সহ বিভিন্ন দিক। এত সবের পরও অভিজ্ঞজনদের অভিমত, রাজ্যবাসীদের সঙ্গে আগত তীর্থযাত্রীদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে না। তাই সমস্ত অহংকার ভুলে সারা দেশ থেকে আগত তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেওয়াটাই সময়ের দাবি।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার আট পাতা বৃদ্ধি এবং আংশিক রঙিন হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকদের কথা ভেবে আমরা পত্রিকার মূল্যবৃদ্ধি করিনি, পুরানো দামেই (১০ টাকা) এতদিন আমরা পরিবেশন করে এসেছি। কিন্তু ক্রমাগত ছাপার কাগজ ও অন্যান্য খরচ বেড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই স্বস্তিকার মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে 'স্বস্তিকা'র প্রতি কপির দাম ১২ টাকা হচ্ছে। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা।

আশা করি, আমাদের অসুবিধার কথা অনুভব করে আপনারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

—সম্পাদক, স্বস্তিকা

পৌষপার্বণ ও বাংলার কৃষিকৃষ্টি

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

গ্রামীণ জীবনে ধানই ছিল ধন, তাই মানুষের মনোভূমে ধান্য-লক্ষ্মীর আবির্ভাব। আর মান্যতা পেত গোধন— ''ধান ধন বড়ো ধন বড়ো ধন আর ধন গাই।/ সোনারূপা কিছু কিছু আর সব ছাই।'' এই ধান্যসম্পদের প্রতি, গো-সম্পদের প্রতি গ্রাম ভারতের চিরকালীন কামনা; তাকে গোলায় গোলায় পূর্ণরূপে ভরার সনির্বন্ধ আকুতি, নিজের সন্তানকে দুধে ভাতে রাখার এক অসামান্য মিনতি— ''গোরু জরাধান/রাখো বিদ্যমান।'' বাঙ্গালির যখন গোলায় গোলায় ধান, তখনই গলায় গলায় গান। অন্তরের কথা যেন কথা সাহিত্য হয়ে বের হয়ে আসে আলগোছে ''যার আছে গোলায় ধান/তার আছে কথার টান।'' পৌষ পার্বণ ও আনুপূর্বিক কৃষি-সাংস্কৃতিক কৃত্য হচ্ছে ধান কেন্দ্রিক অখণ্ড কৃষির পরিপূর্ণ রূপ; ধান্য- লক্ষ্মীর অনাবিল উপাসনা। এ হলো শালিধানের পৌষালি কৃত্য; হৈমন্তিক ধানের বাস্তবিক সত্য, আমনের ধান চাল হয়ে বেরিয়েছে— এ সেই ব্রীহি ধানের সাংস্কৃতিক চালচিত্র।

পৌষ-সংক্রান্তিতে পূজিতা হন পৌষলক্ষ্মী; কোথাও পৌষ-পার্বণের নামই 'নবান্ন'— ''প্রথম অগ্রহায়ণ মাসে নয়া হেউতি ধান।/ কেউ কাটে কেউ ঝাড়ে কেহ করে নবান।'' শাস্ত্রীয় ও লৌকিক আচার মিলেমিশে একাকার। উৎসবের নাম যাই হোক, তা আদতে ধান্যোৎসব, যার ভরকেন্দ্র জুড়ে আছে নানান শালিধানের স্তূপ— ''পাকে ধান্য নানা জাতি/কতো হীরা লীলামতি।'' দেবীর আবরণ ও আভরণ হয়ে ওঠে নানান ধান-বৈচিত্র্য; কোনোটি দেবীর আলতা, কোনটি পাসুলি, কোনটি আবার গলার সাতনরী হার; চুলের সৌকর্য, সিঁথির অলঙ্কার আর পায়ের নূপুর— ''পারিজাত ধান্যের পরিলা অঙ্গহার।/ঊরুর উপরে পরেন বড়ো শোভা তার।।/ সূর্যভোগ চন্দ্রমণি কোমরে পরিল।/ নয়ানে অঞ্জন লক্ষ্মীকাজল করিল।।/ মুক্তাশাল সিঁথায় সিন্দুর শোভা পায়।/ কববি আঁটিল ধান্য কামিনীজটায়।''

বাঙ্গলার মনীষা ভেবেছে, ধান প্রকৃতির দান, ঈশ্বরের কৃপা, সে তো কারও ব্যক্তি সম্পদ নয়! ধানের উৎপাদন-বন্যা যেন ভগবতীর বাৎসল্য ধারা; সে করুণাধারা ধান্যসম্পদ হয়ে আমাদের গোলায় অধিষ্ঠান করে, উদর পরিতৃপ্ত করে। তাই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখছেন, নবান্নের অন্ন আমরা একা গ্রহণ করি না। আত্মীয়স্বজনকে দিই, পাড়া-প্রতিবেশীকে বিলাই, গ্রামের সকলকে সাধিয়া বিতরণ করি, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকলকে অর্পণ করি। কেন?... আমার যে ক্ষুধা, তাহা যে বিশ্বেরও ক্ষুধা...। তিনি লিখছেন, লক্ষ্মীকে লক্ষ্মীরূপেই বরণ করিতে হয়, আর যাঁহার করুণা ধান্যের স্বর্ণাবরণের অন্তরালে শস্যরূপে প্রাণপদ, তাঁহারও পূজা করিতে হয়। তবে ইহার মহিমা থাকে। এই জন্যই বুঝি নবান্ন ও পৌষ সংক্রান্তিতে ধান্যলক্ষ্মীর পুজো আর পাল-পার্বণ। আর এজন্য পৌষ কৃষকের উৎসব। কৃষিজীবী মানুষ পৌষ সংক্রান্তির পূর্বদিবসে পালন করে 'আউড়ি-বাউড়ি'-র লোকাচার। সে যেন দেবী লক্ষ্মীর মর্ত্য-জীবনচক্র; ইকোসিস্টেমের জলচক্র আর সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার গ্রামীণ-সংবিৎ। সিন্ধু-সাগরে দেবী লক্ষ্মীর আবাসন, সাগরের জল উবে ধোয়াডানা মেলে মেঘ হয়ে যান দেবী, মেঘে ভর করে দেবীর উড়ান রাঢ়বঙ্গের নীলাকাশে; বর্ষার মেঘমালা বর্ষণ হয়ে জন্ম নেয় মাটির কৈশিক জল আর তারই কাদামাটিতে লালিত পালিত হন ধান্যলক্ষ্মী, কৃষকের সবুজ ক্ষেত্রে। অবশেষে সবুজ

হিন্দোল রূপান্তরের পথে হয়ে ওঠে সোনালি ফসল; কৃষকের কাস্তেতে চয়িত হয়ে দেবী গোযানে চেপে আবির্ভূত হন কৃষকের গৃহে। এটাই হলো 'আউনি' বা আগমন, কথ্য ভাষায় 'আউড়ি'। তারপর দেবী সস্নেহে চেয়ে দেখেন বাংলার ঘর-গেরস্থালি, বুভুক্ষু মানুষের উদরের জঠরের জ্বালা। এটাকেই বলা হয় 'চাউনি', বা চেয়ে দেখা, লোক ভাষায় 'চাউড়ি'। তারপর গৃহলক্ষ্মী-বধূর পরম আহ্বানে চঞ্চলা লক্ষ্মী বাঁধা পড়েন গৃহের আনাচে কানাচে, গোলাঘরে, বাক্স-তোরঙের ডালায়, রান্নাঘরে, নানান গৃহ-তৈজসে— গোবরের সঙ্গে মুঠকাটা খড় পাকিয়ে অচ্ছেদ্য বন্ধনে দেবীকে অচলা করার মেয়েলি আচার পালিত হয়। এরই নাম 'বাউনি' বা বন্ধন, লোকভাষায় 'বাউরি'। এ তিন লোকসাংস্কৃতিক কৃত্য মিলিয়ে 'আউড়ি-বাউরি' লোকাচার। রাঢ়-বাংলায় তার নানান অধিরূপ।

বাঙ্গলার কৃষিক্ষেত্রে ধান-সম্পৃক্তিতে নানান সময়ে লক্ষ্মী উপাসনার যে বহুতর ধারা পরিলক্ষিত হয়, তার অন্তিম পর্ব হলো পৌষ-পার্বণ। কখনো ধানের ক্ষেত্রে বৃষ্টি আনার মেয়েলি অনুষ্ঠান ভাঁজো; ভাদ্র-আশ্বিনে ইন্দ্র-দ্বাদশী তিথিতে বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রকে তুষ্ট করে নৃত্যগীত পরিবেশন; কখনো গর্ভিণী ধানের সাধ-ভক্ষণ অনুষ্ঠান নল-সংক্রান্তি, ধান ফুলের ছড়া আবৃত্তি; কখনো মুঠকাটা ধান নিয়ে জলের ঝারা ছিটিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, উলুধ্বনি দিয়ে গৃহকর্তার মাথায় চেপে দেবীর গৃহে আগমনবার্তা। আশ্বিন সংক্রান্তির 'ধার ডাকা'-র সময় ধানের ডগা পোয়াতি মায়ের পেটের মতোই ফুলে ওঠে, এটি ধানের থোর দশা বা বুকিং স্টেজ, এটিই হলো 'ধানের গর্ভসঞ্চার'। কৃষিজীবী মানুষ এই সময় থেকেই পৌষপার্বণের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ধানক্ষেতে নলপুজো করে নল-খাগড়ার প্রভূত প্রজনন ক্ষমতাকে ধান-ফসলে সঞ্চারিত করতে চায়, ফলাতে চায় প্রচুর ধান; এ এক অনুকরণাত্মক জাদু বিশ্বাস। সশিষ নলগাছ কেটে নানান বনৌষধি ও অন্যান্য সামগ্রী বোয়াল পাতায় মুড়ে রাঢ়বঙ্গে ধানজমিতে নলগাছের পাতায় বাঁধা হয়; থাকে বুনো ওল, কেশুতের শেকড়, রাই সরষে, হলুদ, নিম, শুকনো পাতা, চালের ক্ষুদ। নলের গোড়া ধুয়ে শালুক ফুলে জড়িয়ে ধানক্ষেতে নল পুজো করেন কৃষক।

কার্তিক সংক্রান্তিতে উত্তরবঙ্গ ও সন্নিহিত বাংলাদেশে শস্যদেবতা কার্তিককে পুজো করা হয়, কাটোয়া মহকুমায় পরে তিনিই (নবানে কার্তিক) পূজিত হন নবান্নের উৎসবে। কার্তিক সংক্রান্তিতে গাওয়া হয় ফসল-সুরক্ষার গান— ''কাল না ছেলেটায় ডাক দিয়া কইয়া যায়/ বাদুড় পড়িছে খেতে/ আরে রে বাবুইরে/খেতের পাকে ধান না খাইলে।'' কার্তিক থেকে অঘ্রাণ সংক্রান্তি পর্যন্ত হৈমন্তী ধান মাড়াই ও ঝাড়াইয়ের শুভপর্বে উদ্‌যাপিত হয় ইতুলক্ষ্মী, তার ইতিহাস অধরাই থেকে যায়। রবিবার ইতুর সাপ্তাহিক পুজো; এরই মধ্যে উদ্‌যাপিত হয় নবান্ন; ইতু উদ্‌যাপনের একেবারে শেষ পর্বে নিবেদিত হয় নতুন চালের পিঠে, মুঠপিঠে আর পরমান্ন; আর বাংলার কোথাও কোথায়ও এরই নাম 'সাধ'।

নবান্নের পূর্বে পাকাধানের আড়াই মুঠ কেটে, বাড়িতে এসে অনুষ্ঠিত হয় লক্ষ্মীপুজো। তারপর নবান্নে লঘু চাল থেকে প্রস্তুত হয় নানান পিঠেপুলি; তা থরে থরে সাজিয়ে দেওয়া হয় দেবভোগ আর পিতৃভোগের জন্য। ধান্যলক্ষ্মী ঘরে এসেছে যে! গৃহাঙ্গন লেপে-পুছে আলপনার নান্দনিকতায় শিল্প-মুখর; ভরা মরাইয়ের পাশে তার নানান চিহ্ন-সংকেত; কৃষিজীবী মানুষের কামনার ভাষা নন্দনতত্ত্ব হয়ে দেখা দেয়। তাতে ধানের ছড়া আঁকা, লক্ষ্মীর জু-মর্ফিক ফর্ম প্যাঁচাই-লক্ষ্মীর চিত্র, পদ্মাসন, গো-সম্পদের রূপক-সংকেত, দালান কোঠার সরল অবয়ব, গৃহস্থালি নানান সামগ্রীর চালচিত্র পিটুলির টানে প্রকাশিত।

অবশেষে এসে যায় পৌষ সংক্রান্তি; সূর্য ধনু রাশি থেকে মকরে সঞ্চারিত হন, তাই এর নাম 'মকর সংক্রান্তি'; এই দিন থেকেই সূর্য দেবতার উত্তরায়ণ যাত্রা, তাই এর নাম 'উত্তরায়ণ সংক্রান্তি'। বাঙ্গলায় এটি 'পিঠেপরব' আর বসতভিটায় বাস্তুপূজার দিন। পৌষপার্বণের দিন কিংবা তার পূর্বদিনে তুলসীমণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয় এই পূজা। কোথাও 'ঝিকা' গাছের ডাল কেটে এনে তার তলায় পুজো হয়, মাটির হাঁড়িতে পাটশলমির আগুনে দুধ-চাল-বাতাসা ফুটিয়ে 'চরু' রেধে বাস্তুদেবতার ভোগ তৈরি করেন পুরোহিত। পৌষপার্বণের দিন উঠোনে মড়াইয়ের পাশে পূজিতা হন পৌষলক্ষ্মী।

পৌষমাসের শেষ সপ্তাহব্যাপী গ্রাম-বাঙ্গলায় পিঠেপুলির সমারোহ। নতুন চালের গুঁড়ি বা 'সবেদা' (সবেদা ফলের শাঁস জিভে যেমন দানাময় অনুভূতি আনে, চালের গুঁড়িও সেই গ্রোথনে ভাঙ্গা হয়, তারই অনুষঙ্গে এই নাম), খেজুরগুড়, নারকেল কোড়া, কলাই ডালের মণ্ড, মুগডাল সিদ্ধ, ক্ষীর ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুত হয় নানান সুস্বাদু খাবার। পৌষপার্বণের দিন তার এলাহি সমারোহ— চন্দ্রপুলি, মোহনবাঁশি, ক্ষীরমুরালী, চন্দনপাট্টা; তৈরি হয় সেদ্ধ পিঠে, ভাজা পিঠে, সরুচাকলি; নানান বৈচিত্র্যের চিত্যেই পিঠে, গোকুল পিঠে, পাটিসাপটা, পাকান, ভাপা, কুলশি পিঠে, কাটা পিঠে, চাপড়ি, চুটকি, নকশি, হাঁড়ি পিঠে, ঝুড়ি পিঠে, পাতা পিঠে, তেজপাতা পিঠে, পোয়াপিঠে, ফুলঝুরি পিঠে, খেজুরপিঠে, চুষিপিঠে ইত্যাদি। বাংলার কোনো বনবাসী কৌমসমাজে তৈরি হয় মাংসপিঠে আর সবজি পিঠে।

পৌষপার্বণের দিন বাঙ্গালার উঠোন এক আশ্চর্য নান্দনিকতায় ভরে ওঠে; গোবরজলে নিকোনো গোটা উঠোন জুড়ে আলপনার নানান সৌকর্য। ধানের ছড়া, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, দেবীর গয়না, চাষের উপকরণের চিত্র—গোরু, লাঙল, জোয়াল, মই আঁকা হয় পরম আনন্দে; পৌষ গাদা থেকে পুজোর সামিয়ানা, পুজোস্থল থেকে গৃহ-সিংহাসন— সর্বত্রই মা লক্ষ্মীর শুভ পদচিহ্ন আঁকা। পিটুলিগোলা পায়ে পা ফেলে ফেলে দেবী কৃষকের গৃহে আসবেন, হবেন অচলা। যেহেতু বাইরে পুজো করে গৃহে লক্ষ্মী আনার ব্যবস্থা তাই কোথাও এর নাম 'বাহির লক্ষ্মীপূজা'। লক্ষ্মী পূজিত হবার পর রাতে যখন তাঁর বাহন পেঁচা বা শেয়াল (দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের বিশ্বাস) ডেকে ওঠে তখন গৃহকর্ত্রী লক্ষ্মী তুলে ঘরে আনেন তাঁকে। বাঙ্গলার কোনো কোনো অঞ্চলে পৌষপার্বণের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হলো 'পৌষ-আগলানো'। বাঙ্গালি রমণী পৌষ বন্দনা করে গেয়ে ওঠে, ''এসো পৌষ যেও না/জন্মে জন্মে ছেড়ো না।/পৌষের মাথায় সোনার বিঁড়ি, /হাতে নড়ি কাঁকে ঝুড়ি,/পৌষ আসছে গুড়ি।/ আনবো গাঙের

জল/ ঘরে বসে নেয়ো খেয়ো।/ বাহান্ন পেটটি হয়ো/ ঘরে বসে পিঠে খেয়ো।/ এমন সোনার পৌষ জন্ম জন্ম হয়ো।" কোথাও বানানো হয় 'পৌষবুড়ি'-র গোবরমূর্তি। সোনার পৌষকে ছাড়া যাবে না, তাকে বাঁধতে হবে, শস্য-সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করতে হবে। বাঙ্গলার নারী তাই ঘরের আঙিনায় সোহাগি পৌষকে নানান মৌখিক সাহিত্যের ঝাঁপি নিয়ে আগলায়।

বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে পৌষমাসের শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবার পৌষলক্ষ্মীর পুজো অনুষ্ঠিত হয়। এ দেবীর অ্যানথ্রোপোমর্ফিক প্রতিমাপূজা নয়, নতুন ফসলের নৈবেদ্যে, নতুন ধানের অলঙ্কার নির্মাণ করে, নতুন চালের গুঁড়িতে প্রস্তুত লক্ষ্মীদেবীর পদচিহ্ন এঁকে দেবীর আরাধনা— শস্যদেবীর বোটানিক্যাল ফর্ম যা 'কোজাগরী লক্ষ্মী' থেকে দৃশ্যতই আলাদা। ধনের দেবীর তুলনায় ধানের দেবীর প্রকাশ মূর্ত হয়ে ওঠে, সমগ্র বাঙ্গালা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এক শস্যদেবীর ঐতিহ্য।

পৌষপার্বণের অপরিহার্য আঙ্গিক তার অনুপম আলপনা। আলপনার ঠাট, রূপক সংকেত নিয়ে অনেক গবেষণাই হয়েছে। আলপনা যখন 'the art of drawing ails (embankment)' তখন তার কৃষি-সম্পৃক্ততা অবশ্য বিবেচিত। বর্তমানের আলপনায় যে জ্যামিতির প্রকাশ, তার সূত্রপাত হয়তো জমি তৈরি আর তা সমতল করে তোলার প্রাচীন প্রক্রিয়া থেকে। জোয়াল-বাহিত আদি লাঙ্গলের মৃত্তিকা খননে তৈরি হয়েছিল মাঠের আলপনা, তার দু'পাশে বলদ-গোরুর পদচিহ্ন, জমি কর্ষণে উঠে আসা পোকামাকড়ের লোভে ধেয়ে আসা পাখপাখালির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পদচিহ্ন, সর্বোপরি মাঠ ভর্তি পাকা ফসলের স্বতন্ত্র সমারোহ— সব মিলিয়ে মানুষের সহজাত নান্দনিকতায় গড়ে উঠেছে ব্রতপূজার আলপনা, তাতে অনবধানে মিলেমিশে একাকার অন্তরে উদ্ভাসিত প্রকৃতির কৃষি-বাস্তুতন্ত্র। মানুষের মনে জারিত হয়ে আলপনা হয়ে ওঠে কৃষিজীবী মানুষের জাদুবিশ্বাস আর নান্দনিকতার মিলিত ফসল।

শুধু যে পৌষলক্ষ্মীর পুজোর স্থলেই আলপনা আঁকা হয়, তা নয়, আলপনা দেওয়া হয় সংরক্ষিত বীজধান রাখার মাটির কলসিতে এবং তার বেদীতে। আলপনা দেওয়া হয় পৌষ সংক্রান্তির পর দিনও, এদিন কোনো কোনো জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় 'যাত্রালক্ষ্মীর পুজো'। কোথাও এর নাম 'বাউনি পুজো'। উঠোনের মাঝে কৃষিসরঞ্জাম রেখে চারপাশ জুড়ে আঁকা হয় আলপনা। যে সরঞ্জাম দিয়ে এ যাবৎ কৃষিকাজে সাফল্য এসেছে, আজ তারই ধন্যবাদাত্মক চিন্তন-পূজন; আজ সেগুলিরই কাদামাটি ধুয়ে পরিচ্ছন্ন করার দিন। এই আলপনা-বিলাসে কী না নেই। জোয়াল, লাঙল, নিড়ানি, কাচি, খুরপি, কাস্তে, কোদাল, শাবল, দা, কুড়ুল। কোথাও তার প্রতিরূপগুলিও সহজ সরল টানে আঁকা হয়; যেন গৃহের শিশু, বালক-বালিকাকে কৃষিযন্ত্রপাতির অবয়ব চেনানোর ও কার্যকারিতা বোঝানোর এক বার্ষিক মরসুম।

ক্ষেতের ধান প্রথমে এসে কৃষকের খামারে ওঠে, তারপর মাড়াই-ঝাড়াইয়ের পর যায় গোলায়। ধান-রক্ষিত খামারেও তাই মা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। কৃষক-রমণী তাই খামারেও আঁকেন নানান আলপনা, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, পদ্মফুল। যেদিন প্রথম ধান খামারে মাড়াই করা হবে, সেদিন খামার পুজো করার আনুষঙ্গেও মেহীখুঁটি, মুঠ-ধানের মুঠি, ধামাকুলো, দাওনদড়ি ও বলদের পাশে দেওয়া হয় 'রেখা-আলপনা'। নবান্নের দিন কোনো কোনো জায়গায় চাল দিয়ে গুঁড়ি আলপনা দেওয়ার চল আছে। বাড়ির সদর দুয়ার থেকে লক্ষ্মীর আসন পর্যন্তও আঁকা হয় আলপনার নানান ঠাট। এছাড়া লক্ষ্মীগোলাকে কেন্দ্র করে বিন্দু দিয়ে শুরু করে উপর্যুপরি ক্রমবর্ধমান বৃত্তাকার আলপনা, তাতে জুড়ে থাকে মইয়ের নকশা। গোলার গায়েও আলপনা দেওয়া হয়। এছাড়া পৌষ-পার্বণ উপলক্ষ্যে লক্ষ্মীব্রতের চালিতে আঁকা হয় পেঁচার ঠাট।

মকরস্নান আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা জড়তা-জড়িমা-তামসিকতার অবাধ্য-রিপুকে জয় করার সংগ্রাম। বাংলার কুমারীকুলও একসময় মাসব্যাপী মকরস্নান ব্রত শুরু করতো, ঠাণ্ডার ভোরে দিদা-ঠাকুমার হাত ধরে পাঁচডুবি স্নান আর মকর স্নানের ছড়ার আবৃত্তি— ''এক ডুবিতে আই-ঢাই।/ দুই ডুবিতে তারা পাই।/ তিন ডুবিতে মকরের স্নান।/ চার ডুবিতে সূর্যের স্নান।/ পাঁচ ডুবিতে গঙ্গাস্নান।" দেশ জুড়েই মকর সংক্রান্তির দিন নদী বা সাগরে পুণ্যস্নান। প্রয়াগ, হরিদ্বার, গড় মুক্তেশ্বর, গঙ্গাসাগরে স্নান উপলক্ষ্যে জমজমাট মেলা। প্রয়াগে পূর্ণ ও অর্ধকুম্ভের সূচনা আর তাতে দেশব্যাপী সাধুসন্তের পুণ্যআগমন।

কৃষকের অন্নের ভাণ্ডার যখন পূর্ণ, গোলায় সম্বৎসরের রসদ যখন মজুত, তখনই আসে 'পৌষপার্বণ'। কাজেই এ এক শান্তি আর সমৃদ্ধির উৎসব। ভারতবর্ষের নানান অঙ্গরাজ্যে তার বহুধা বিস্তৃতি। কোথাও এর নাম 'পোঙ্গাল', কোথাও 'হোহরি', কোথাও 'ভোগলি বিহু', আবার কোথাও 'ইল্লুবিল্লা'। এরকমভাবে কোথাও এর নাম 'খিচরি', 'উত্তরণ', 'মাঘী', 'তিলগুল', 'সকরাত' প্রভৃতি। তামিল জনগোষ্ঠী এই সময়েই (১৪ থেকে ১৭ জানুয়ারি) পালন করে ঐতিহ্যবাহী ফসলোত্তর 'পোঙ্গাল' উৎসব। অনুষ্ঠানকৃত্য অনেকটা নবান্নেরই মতো। এই গ্রামীণ উৎসবে সালোকসংশ্লেষের দেবতা সূর্যের প্রতি জানানো হয় অপরিসীমে কৃতজ্ঞতা, ফসল ও গবাদি পশুর প্রতি জ্ঞাপিত হয় অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। কর্ণাটক প্রদেশে এই উৎসবেরই ভিন্ন নাম 'ইল্লুবিল্লা' এবং 'মকর সংক্রমণা'। চারদিন ব্যাপী পোঙ্গালের চারটি ভিন্ন নাম— ভোগি পোঙ্গাল, সূর্য পোঙ্গাল, মাতু পোঙ্গাল এবং কানুম পোঙ্গাল। তামিল ও তেলেগুতে 'পোঙ্গাল' শব্দের অর্থ হলো 'হাঁড়িতে সেদ্ধ ভাত'; অতএব এ ভাতের-ই উৎসব। নতুন চালের ভাত খেয়ে নববর্ষ উদ্‌যাপনের এক কৃষিকৃষ্টি। এদিন সেই চালের গুঁড়ো দিয়েই বানানো হয় 'কোলম' আর তা দিয়েই আঁকা হয় আলপনা। পরিধান করা হয় নববস্ত্র, বন ফায়ার করে পুড়িয়ে ফেলা হয় অপ্রয়োজনীয় জিনিস, হতে পারে তা ফসলের খড়-নাড়াও; তার ছাই দিয়ে কৃষিজমি উর্বরা হবে। এদিন বাড়ির প্রবেশদুয়ার সাজানো হয় কাটা আখগাছের কাণ্ড দিয়ে, তাই বাজার জুড়ে আখের ব্যাপক আমদানি। বাড়িতে তৈরি হয় তিল ও নারকোলের নানান ভোজ্যবস্তু।▌

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা

সল্টলেক, করুণাময়ী সেন্ট্রাল পার্ক

৩০ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ স্টল নং ১৬৮ যোগাযোগ : ৯১৬৩১৩০৭১৩

রাজা উশীনর

পুরাকালে শিবি রাজ্যের রাজা উশীনর যেমন জ্ঞানী তেমনি ধার্মিক ছিলেন। তাঁর রাজ্যে প্রজারা সকলেই সুখী। কারো কোনও অভাব নেই, কোনও অভিযোগ নেই।

একবার উশীনর এক যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞ শেষ করে তিনি যা চাইবেন তাই পাবেন। প্রজারাও যে যা চাইবে তাই পাবে। স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের হলো ভয়। যদি উশীনর যজ্ঞের শেষে স্বর্গরাজ্য চেয়ে বসেন। এমন কতবার হয়েছে। তিনি অনেক দুঃখ দুর্গতি ভোগ করেছেন। অসুর আর মানুষের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছেন বহুবার। যদিও রাজা উশীনর এরকম নন।

রাজা উশীনর যজ্ঞ করছেন শুনে দেবতারা ভয় পেয়ে গেল। তারা পরামর্শ করতে বসল ইন্দ্রের সঙ্গে। কী করা যায়! কী করে এই যজ্ঞ পণ্ড করা যায়! সবাই নিজের মত ব্যক্ত করতে ব্যস্ত। আলোচনা আর শেষ হয় না। কী করা যাবে তাও সম্ভব হয় না। এমন সময় সভায় প্রবেশ করলন অগ্নিদেব। তিনি বুঝলেন একটা কিছু ঘটেছে। নিশ্চয় স্বর্গরাজ্যের কোনও বিপদ উপস্থিত। তিনি ইন্দ্রের কাছে যা শুনলেন, তাতে তাঁরও ভয় হলো। উশীনরের যজ্ঞ পূর্ণ হলে সর্বনাশ। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব যাবে, স্বর্গরাজ্য হাতছাড়া হবে আর দেবতাদের দুঃখের অন্ত থাকবে না। ইন্দ্র আর অগ্নি মিলে চিন্তা করতে লাগলেন কী করা যায়। তাঁরা রাজাকে পরীক্ষাও করতে চাইলেন। তার পর অনেকক্ষণ পরামর্শের পর ঠিক হলো অগ্নি পায়রা আর ইন্দ্র বাজপাখির রূপ ধরে উড়ে যাবেন শিবিরাজ্যে।

বাজপাখি হলো সমস্ত পাখির শত্রু। কোনও পাখি আকাশে উড়ছে দেখতে পেলেই বাজপাখি তাড়া করবেই ধরবার জন্য। পায়রারূপী অগ্নিকে তাড়া করলেন বাজরূপী ইন্দ্র। পায়রা প্রাণের ভয়ে আকাশে উড়তে লাগল এবং ছুটতে ছুটতে শেষ পর্যন্ত শিবিরাজ্যে এসে উশীনরের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রাণের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পায়রা বলল— মহারাজ, আপনি দয়া করে বাজের হাত থেকে আমাকে বাঁচান। পায়রার কথার উত্তর দিতে গেলেন উশীনর। তার আগেই বাজপাখি নীচে নেমে এসে রাজাকে বলল— পায়রাকে ছেড়ে দিন মহারাজ। রাজা বললেন, আশ্রিতকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। বাজ বলল আমি ক্ষুধার্ত। আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে আপনার অধর্ম হবে। রাজা বললেন— আশ্রিতকে ত্যাগ করাও তো পাপ। বাজ বলল, তাই বলে আমার আহার থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন মহারাজ? রাজা বললেন, পায়রাই তোমার একমাত্র খাদ্য নয়, তোমাকে অন্য মাংস আমি দিতে পারি। বাজ বলল, তাহলে আপনার শরীর থেকে পায়রার ওজনের মাংস কেটে দিন। আমি না হয় তাই খেয়ে বাঁচি।

বাজপাখির কথা শুনে রাজা খুশি হলেন। বললেন, তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি। রাজার হুকুমে দাঁড়িপাল্লা আনা হলো। এদিকে এ সংবাদে রাজপুরীর সবাই এসে রাজাকে থামানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু রাজা নিজের প্রতিজ্ঞা থেকে টললেন না। দাঁড়িপাল্লায় তিনি একদিকে পায়রাকে বসালেন, আর ডান হাত দিয়ে নিজের দেহের মাংস কেটে কেটে অন্যদিকে দিতে লাগলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নিজের শরীর থেকে রাজা যতই মাংস চাপান, কিছুতেই পায়রার সমান ওজন হয় না। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই পাল্লায় উঠে বসলেন। ইন্দ্র ও অগ্নি আর ছদ্মবেশ থাকতে পারলেন না। তাঁরা 'সাধু সাধু' বলে রাজার সত্যনিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে নিজ নিজ রূপ ধারণ করে বললেন— মহারাজ, আপনি সত্যিই মহৎ। আমরা আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য এসেছিলাম। আপনার মতো ধার্মিক রাজা পৃথিবীতে কমই আছে। আপনার নাম ত্রিভুবনে অমর হয়ে রইল। তার পর অগ্নি ও ইন্দ্র অন্তর্ধান করলেন। রাজার শরীর পূর্বের অবস্থায় এসে গেল। তখন দেবতারা রাজা উশীনরের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

(সংগৃহীত)

ভারতের পথে পথে

বাদামী

কর্ণাটক রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে চতুর্থ থেকে অষ্টম শতকে চালুক্য রাজাদের রাজধানী শহর বাদামী-পাট্টাডাকাল-আইহোল। তিনটি শহরের মন্দিররাজি বিস্ময়ে বিহ্বল করে। শিল্প-সাহিত্য-ভাস্কর্যের পূজারি চালুক্য রাজারা ৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী গড়ে ১৭৬ মিটার উঁচু বাদামীতে। বাদামী নাম হয়েছে মহাতপস্বী অগস্ত্যমুনির সহচর পরাক্রমশালী দানব বাতাপী থেকে। বাদামীর মূল আকর্ষণ লাল বেলেপাথরের অনুচ্চ এক পাহাড় কুঁদে তৈরি গুহামন্দির। ৪টি কৃত্তিম, একটি প্রকৃতি সৃষ্ট। বেলেপাথরের ঢাল বেয়ে দুশো সিড়ি পেরিয়ে গুহামন্দিরে পৌঁছতে হয়। ২ টি বিষ্ণু, ১ টি শিব এবং ১ টি জৈনমন্দির। অজন্তার সমসাময়িক এবং অজন্তারই প্রতিচ্ছবি এই গুহা স্থাপত্য। এর পাশে রয়েছে অগস্ত্যতীর্থ বা ভূতনাথ লেক। লেকের অপর পাশে মহাকুটেশ্বর ও মালেগিট্টি শিবমন্দির। পশ্চিম পাড়ে রয়েছে ভূতনাথ মন্দির। এখানকার দশেরা উৎসবে দেশদেশান্তর থেকে পর্যটকরা ভিড় করেন।

জানো কি?

- ভারতের দু'হাজার টাকার নোটের সাইজ ১৬৬ X ৬৬m।
- পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাখি মাছরাঙা।
- গোয়া রাজ্য সরকার প্লাস্টিক ব্যাগ পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।
- নাগপুর শহরে দ্রুত ইলেকট্রিক ক্যাব চালু হয়েছে।
- উত্তরপ্রদেশ সরকার মিড ডে মিলের গুণগত মানের জন্য 'মা কমিটি' চালু করেছে।
- রেল মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী বিশাখাপত্তনম্ রেলস্টেশন সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন।

ভালো কথা

আমাদের চিপকো আন্দোলন

ক'দিন আগে কয়েকজন লোক আমাদের পাড়ার মাঠের কদমগাছ আর পাশের পুকুরপাড়ের অশ্বত্থগাছটা কাটতে এসেছিল। পাড়ার বিকাশদাদু খুব প্রকৃতিপ্রেমী। তিনি আগে থেকেই পাড়ার ছোটোদের নিয়ে 'নেচার সেভার' গ্রুপ তৈরি করেছেন। আমি গ্রুপের সহপ্রধান। প্রতিদিনের মতো সেদিন বিকেলে মাঠে খেলতে গিয়ে দেখি লোকগুলি গাছ কাটতে এসেছে। প্রথমে আমরা ওদের বারণ করি। কিন্তু ওদের সর্দার আমাদের ধমক দেওয়ায় বিকাশদাদুর কাছে ছুটে যাই। বিকাশদাদু মাঠে এসেই আমাদের গাছদুটোকে জড়িয়ে ধরতে বললেন। আমরা দুটি গাছদুটোকে জড়িয়ে ধরলাম। লোকগুলো দাদুর সঙ্গে তর্ক শুরু করে দিল। হৈচৈ শুনে পাড়ার বড়োরা এগিয়ে এল। নিরুপায় হয়ে লোকগুলো ফিরে গেল। বড়োরা আমাদের প্রশংসা করতে লাগলো। বিশুকাকু খুশি হয়ে তাদের বাড়ির ছাদে আমাদের জন্য পিকনিকের আয়োজন করল। এত প্রশংসা পেয়ে আমাদেরও প্রকৃতি বাঁচানোর উৎসাহ বেড়ে গেল। তবে প্রথমবার চিপকো আন্দোলন করে গাছ বাঁচানোর অভিজ্ঞতা সারাজীবন মনে থাকবে।

রূপষা দেবনাথ, নবমশ্রেণী, নিমতা, কলকাতা-৪৯।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

মোবাইল নেশা

শুভম প্রামাণিক, দশম শ্রেণী,কদমতলা, সাহাপুর, মালদা।

ফেসবুক হোয়টস্অ্যাপ
আরও কত কী
পড়াশোনায় মন থাকে না
মোবাইলে মেতে থাকি।
ফেসবুকে ছবি ছেড়ে
হতে চাই হিরো
ফোন নিয়ে পড়ে থেকে
পরীক্ষায় পেলাম জিরো।

স্কুলে যাই না আমি
থাকি শুধু বাড়িতেই
মন শুধু পড়ে থাকে
লাইক পাওয়ার আশাতেই।
যদি তুমি পরীক্ষায়
জিরো পেতে চাও না
মোবাইলের ধারে কাছে
একেবারে যেও না।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।।৫।।

ঋষি কেন নীরব ছিলেন জেনে রাজা অনুতপ্ত হলেন।

তিন মেরু যার পদতলে

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যরূপ সিদ্ধান্ত। পাহাড়ের চূড়া থেকে মেরুগহ্বর যার পদতলে, একসময়ে হাঁপানির রুগি হিসেবে তার প্রাণটাই যেতে বসেছিল। এহেন বীরসিংহ আজ শুধু বাঙালি কেন, আপামর ভারতবাসীর কাছে প্রেরণার আলোকস্তম্ভ। বিশ্বের ছয় মহাদেশের সবকটি সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয় করার পর একটি বাদে সবকটি আগ্নেয় পর্বত জয় করা হয়ে গেছে। সফল অভিযান করেছেন মেরু অঞ্চলেও। দুনিয়ার সর্বকালের সেরাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। এক্সপ্লোরার্স গ্রান্ডস্লামের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে খোলামেলা কথাবার্তায় উজাড় করে দিলেন নিজেকে।

□ কেন অ্যান্ডভেঞ্চারধর্মী খেলায় অগ্রসর হলেন—

● **সত্যরূপ :** শৈশব থেকেই হাঁপানির রুগি আমি। স্কুল-কলেজে সমস্তরকম খেলাই খেলেছি। কিন্তু অ্যাজমা থাকায় বেশি পরিশ্রম করতে পারতাম না। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বেঙ্গালুরুতে চলে যাই ২০০৫ সালে, ২৪ বছর বয়সে। তখন আর ইনহেলার ব্যবহার করতাম না। শুধু যোগাসন করে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলাম। সেসময়ে কর্মক্ষেত্রে আমার বস একদিন বিশ্বের কয়েকটি বিখ্যাত পর্বতমালার ছবি দেখান আর আমাকে অনুপ্রাণিত করেন মাউন্টেনিয়ারিংয়ের ব্যাপারে। আমার বেসিক ট্রেনিং ছিল। আর তখনই ওখানে একটি বড়ো মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবে যোগদান করি। এরপর কর্ণাটক-সহ দক্ষিণ ভারতের প্রতিটি পর্বতে অভিযান করে নিজেকে হিমালয় অভিযানের জন্য তৈরি করি।

□ এভারেস্ট জয়ের পর কী অনুভূতি হয়েছিল?

● **সত্যরূপ :** 'অলটাইম গ্রেট' জর্জ ম্যালোরির এভারেস্ট বিষয়ক বই 'পাথস্ অব গ্লোরি' পড়ে মনে মনে শপথ নিয়ে ফেলি একদিন বিশ্বের শীর্ষবিন্দুতে পা রাখতেই হবে। সেই মতো দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে বেসিক ও অ্যাডভান্সড কোর্স করে নিই। জানি চাকরি ছেড়ে দুর্গম পর্বত-সমুদ্রে অ্যাডভেঞ্চার জীবন বেছে নিয়ে চরম ফাটকা খেলেছিলাম। এভারেস্ট জয়ের পর (২০১৬) মনে হয়েছিল আমি এই ভূমণ্ডলের রাজা। যে এভারেস্টের টানে দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে দশকের পর দশক অভিযান চলেছে, তা কিনা আমি সফলভাবে করে উঠতে পেরেছি। তবে এভারেস্ট জয়ের আগে আফ্রিকার সর্বোচ্চ মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো, উত্তর আমেরিকার মাউন্ট ভেনালি, দক্ষিণ আমেরিকার মাউন্ট অ্যাকনকাগুয়া, ইউরোপের মাউন্ট এলবুস জয় করা হয়ে গিয়েছিল। তারপর বাকি দুই ওশেনিয়ার কার্সটেনজ পিরামিড, দক্ষিণ মেরুর ভিনসন ম্যাসিফ জয় করি।

□ ভলক্যানিক সামিটের ব্যাপারে কিছু বলুন—

● **সত্যরূপ :** সব মহাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয় করার পর মনে রোখ চেপে যায়। এবার সবকটি আগ্নেয় পর্বত জয় করতে হবে। তবেই অ্যাডভেঞ্চার গেমের ষোলোকলা পূর্ণ হবে। সেইমতো একে একে ইন্দোনেশিয়ার কার্সনেটজ পিরামিড, চিলির ডেল সালাডো, মেক্সিকোর পিকো ডি ওরিজাবা, ওশেনিয়ার মাউন্ট কজিওস্কো অতিক্রম করেছি। এছাড়া আরও দুই আগ্নেয় পর্বত শৃঙ্গ সামিট করেছি। এবছরের শুরুতে আন্টার্কটিকার মাউন্ট সিভলি অভিযানে বেরোব। যদি এটি হয়ে যায় তবে আমি সেভেন মাউন্টেন পিক সামিট এবং সেভেন ভলক্যানিক সামিট কমপ্লিট করে অনন্যসাধারণ কীর্তির অধিকারী হব সবচেয়ে কম বয়সে। ভারতে এ ব্যাপারে আমি প্রথম ব্যক্তি হিসেবে চিরকালীন ভাবে ইতিহাসে স্থানলাভ করব। বিশ্বের মধ্যে প্রথম এই কৃতিত্বের অধিকারী হন মহান ব্রিটিশ অভিযাত্রী স্যার ক্রিস বলিংটন।

□ ভারতে মাউন্টেনিয়ারিংয়ের ভবিষ্যৎ কী?

● **সত্যরূপ :** বিশ্বের অন্যান্য অভিযানসমৃদ্ধ দেশগুলোর সঙ্গে ভারতও পর্বত, মেরু, সমুদ্র অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠেছে। ভারতের কিংবদন্তী বঙ্গসন্তান সত্যব্রত দাস তিন ভুবনের তিন মেরু জয় করে (এভারেস্ট উত্তর ও দক্ষিণ মেরু) গিনেস বুক অব রেকর্ডে নাম তুলে নিয়েছেন বহির্বিশ্বের গুটিকয়েক কিংবদন্তীর সঙ্গে। জামসেদপুরের মধ্যবয়সী গৃহবধূ প্রেমলতা আগরওয়াল বিশ্বের সপ্তশৃঙ্গ ও সপ্তসিন্ধু জয় করে বহুমাত্রিক কীর্তিগৌরবে অলংকৃত।

ইউরোপিয়ানদের সঙ্গে সমানতালে প্রতিবছর এদেশ থেকে বহু পর্বতারোহী ও সমুদ্র অভিযাত্রী নানাবিধ অ্যাডভেঞ্চার করছেন সফলভাবে। এদেশে প্রতিটি রাজ্যে অসংখ্য ক্লাব তৈরি হয়েছে। টাটা ও রিলায়েন্স জামসেদপুর ও রাজকোটে অ্যাডভান্সড অ্যাকাদেমি করেছে। উত্তরকাশী ও দার্জিলিংয়ে সরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট। অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জাম সহযোগে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আজ প্রতিটি ক্লাবেও আধুনিক পরিকাঠামো রয়েছে। দেশের তরুণ-যুব প্রজন্ম যথেষ্ট সংখ্যায় আসছে সবরকম অ্যাডভেঞ্চার গেমে। যে দেশে আছে পর্বতের সম্রাট হিমালয়, সেদেশে যুবক-যুবতী অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় হবে এটাই স্বতঃসিদ্ধ। ■

চলে গেলেন চেন্নাইয়ের পাঁচ টাকার ডাক্তারবাবু

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আধুনিক হয়ে ওঠার শর্ত কি হৃদয়কে অস্বীকার করা? কিংবা যদি বলা হয়, যে যত হৃদয়হীন সে ঠিক ততটাই আধুনিক, তাহলে কি সরলীকরণ হয়ে যাবে? মানছি, প্রশ্নগুলো গোলমেলে। কিন্তু আধুনিক সময়ের পেশাজীবী মানুষদের কথা ভাবলে বেশিরভাগ লোকেরই বোধহয় এক ধরনের যান্ত্রিক শীতলতার অনুভূতি হয়। অন্তত তাদের একটা বড়ো অংশই যে ক্ষমতা, অর্থ আর খ্যাতির লোভে যন্ত্রে পরিণত হয়েছেন সে ব্যাপারে সন্দেহ করা চলে না।

আমাদের ভাগ্য ভালো সবাই এরকম নন। কেউ কেউ থাকেন যাঁরা কখনও ভোলেন না তারা আগে মানুষ তাঁরপর পেশাজীবী। মানুষের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য কিছু করার আগ আমরণ তাঁদের সঙ্গে থেকে যায়। এরকমই একজন মানুষ এস. জয়চন্দ্রন। ডাক্তার হলেও আগমার্কা পেশাদার নন। কতটা 'অপেশাদার' একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। গরিব রোগীদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক নিতেন মাত্র পাঁচ টাকা। নামই হয়ে গিয়েছিল পাঁচ টাকার ডাক্তারবাবু। সম্প্রতি সামান্য রোগভোগের পর চলে গেলেন। চেন্নাইয়ের অসংখ্য মানুষ এখনও সেই শোকে মুহ্যমান। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় উঠে আসছে ডাক্তারবাবুর প্রসঙ্গ। একটু যাঁরা অবস্থাপন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁরা স্মৃতিচারণ করছেন।

এটাই বোধহয় একজন চিকিৎসকের শ্রেষ্ঠ পাওয়া। অথচ তিনি চাইলে প্রান্তিক মানুষের আপনজন না হয়ে উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসা ব্যবসায়ীও হতে পারতেন। ডাঃ জয়চন্দ্রন ছিলেন মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজের স্নাতক। ষাটের দশকে দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলির মধ্যে মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজ ছিল অন্যতম। এখান থেকে পাশ করে বেরিয়ে পশার জমাতে অসুবিধে হতো না। কিন্তু আমাদের পাঁচ টাকার ডাক্তারবাবু তো পশার জমাতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন প্রসার। তাই ৪৩ বছরের 'কেরিয়ারে' তিনি বেশিরভাগ গরিব রোগীদের চিকিৎসা করেছেন বিনা পারিশ্রমিকে। আর যারা ততটা গরিব নন তাদের কাছ থেকে নিয়েছেন পাঁচ টাকা করে।

উপকৃত রোগীরা ডাক্তারবাবুর হৃদয়বৃত্তির কথা যে ভোলেননি সেকথা আগেই বলেছি। বিনোদ এমনই একজন রোগী। নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন ডাঃ জয়চন্দ্রনের জন্যেই তিনি সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন। কথায় কথায় উঠে আসে, টাকাপয়সার অভাবে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ যারা নিতে পারেন না, তাদের রোগারোগ্যে ডাক্তারবাবুর অবদানের প্রসঙ্গ। বিনোদ বলতে থাকেন, 'আমার তখন সাত বছর বয়েস। একবার বেহুঁশ অবস্থায় আমাকে ডাক্তারবাবুর কাছে আনা হয়েছিল। বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, সন্ধ্যেবেলায় আমি নিজের পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরেছিলাম। এর অনেক বছর পর মেয়েকে দেখানোর জন্য ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার মেয়ে রক্তবমি করছিল। মেয়েকেও সুস্থ করে তুলেছিলেন ডাক্তারবাবু।'

অন্য রকম

ডাক্তারবাবুর এক বন্ধু শোনালেন অন্য কাহিনি। যারা গরিব নন, প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যাদের মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত বলা উচিত, তাদের প্রতিও ছিল ডাক্তারবাবুর দরদ। রোগী যদি বয়স্ক হন কিংবা তার যদি নিজের গাড়ি না থাকে তাহলে ডাক্তারবাবু নিজে সেই রোগীর জন্য রিকশ ডেকে দিতেন। ডাক্তারবাবুর এক বন্ধু বলেন, 'পেশেন্ট ডায়াবেটিক হলে বা পায়ে কোনও ক্ষত থাকলে ওকে জুতো কিনে দিতেও দেখেছি।'

নিজের সম্বন্ধে কী বলতেন ডাক্তারবাবু? বলতেন, 'যদি কেউ নিজে থেকে আমায় টাকা দেন, নেব। যদি না দেয় আমি টাকার কথা বলব না।'

একবিংশ শতাব্দীতে এমন একজন মানুষ ছিলেন, একথা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। বিস্ময় আরও বাড়ে যখন শুনি, ডাঃ জয়চন্দ্রন গরিবের ভগবান হলেও ধনীদের কাছে তাঁর কদর কিছু কম ছিল না। চেন্নাইয়ের উত্তর অঞ্চলে বেঙ্কটাচলম স্টিট পশ এলাকা। এখানেই পাঁচ টাকার ডাক্তারবাবুর বাড়ি। স্থানীয় ধনী ব্যক্তিরা প্রায়শই তাকে হাজার হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিতেন। যদিও ডাক্তারবাবু তাদের ওষুধপত্র কিনে দেওয়ার কথা বলতেন। কেউ কেউ কিনেও দিতেন। ডাক্তারবাবু সেইসব ওষুধপত্র ব্যবহার করতেন গরিব রোগীদের চিকিৎসায়।

সত্যি, আশ্চর্য মানুষ ডাঃ জয়চন্দ্রন। তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র এবং এক কন্যা—সকলেই ডাক্তার। এবং সকলেই আদর্শবাদী। কারণ ডাক্তারবাবু কী বিশ্বাস করতেন তাঁরা জানেন। ডাক্তারবাবু বলতেন, 'আমি যা শিখেছি তাই নিয়ে ব্যবসা করতে চাইনি। চিরকাল জাতি ধর্ম না দেখে সব রোগীর চিকিৎসা করেছি। ডাক্তার হতে পেরেছি এটাই আমার সব থেকে বড়ো সুখ। একজন মরণাপন্ন রোগীকে বাঁচানোর মতো আনন্দ অন্য কোনও কিছুতে নেই।

এখনও কথাগুলো ভেসে বেড়ায়। জীবনের কোলাহল ছেড়ে একটু আড়ালে গেলেই ডাক্তারবাবুর শুভানুধ্যায়ীরা শুনতে পান। ▮

কংগ্রেসের কৃষিঋণ মকুবের দাবি কি রাজনৈতিক স্বার্থে?

জি. বি. রেড্ডি

কৃষিঋণ মকুবের দাবি কি স্রেফ ভোটের জন্য? বাস্তব পরিস্থিতি কী বলছে? একেই কি আমরা 'ভালো রাজনীতি কিন্তু খারাপ অর্থনীতি' বলব?

এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আগে আমাদের জানা দরকার ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে আবশ্যিক শর্তগুলি ঠিক কী। এখন এক একরে একটি পাস বইয়ে শস্যঋণ দেওয়া হয় ৫০,০০০ টাকা করে। কৃষকের অধিকৃত মোট জমির যা বাজারদর তার ৫০ শতাংশ হারে বন্ধকি ঋণ দেওয়া হয়। এর সঙ্গে বলতে হবে ঋতুবন্ধু প্রকল্পের কথা। এই প্রকল্পে প্রত্যেক শস্য চাষ করার জন্য কৃষককে একর প্রতি ৪,০০০ টাকা করে ঋণ দেওয়া হয়।

এবার আসব কৃষকদের সমস্যা নিয়ে রাজনীতি করা প্রসঙ্গে। রাজনীতি যে হচ্ছে সে ব্যাপারে সন্দেহ করা চলে না। পি. চিদাম্বরমের কথাই ধরা যাক। চাষাবাদের সঙ্গে তার নিজেরই কোনও সম্পর্ক নেই। অথচ তিনি ২ একর জমি ১০ বছর চাষ করার পর কৃষিঋণ মকুবের দাবির সমালোচনা করতে বলেছেন। পি. চিদাম্বরম একই সঙ্গে নির্লজ্জ এবং নির্বোধ। যেসব চাষি মাত্র ২ একর জমি চাষ করেন তাদের প্রান্তিক চাষি হিসেবে মেনে নেওয়া যেতে পারে এবং তর্কের খাতিরে এটাও মানা যেতে পারে প্রান্তিক চাষিদের ঋণ মকুব করাই উচিত। কিন্তু যেসব ব্যক্তি কৃষক না-হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের কৃষক বলে দাবি করে করদাতাদের টাকায় অন্যায় সুযোগ নিচ্ছেন তাদের ব্যাপারে পি. চিদাম্বরম কিছু বলছেন না।

আমি নিজে একজন কৃষক। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব রুরাল ডেভেলপমেন্টের পরামর্শদাতা হিসেবে সারা দেশের কৃষকদের সমস্যাগুলি বোঝার এবং তাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আমার হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার নিরিখেই কয়েকটি কথা বলতে চাই।

কৃষি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়। সুতরাং কৃষিঋণ মকুবের বিষয়টিও রাজ্যের এক্তিয়ারে পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান দায়িত্ব হলো— স্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল নির্মাণ, সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য নির্ধারণ, কৃষি পরিকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের রপ্তানি। এই নিবন্ধে আমরা কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। বিষয়গুলি এরকম— (১) চাষিদের শ্রেণীবিন্যাস, (২) শস্যের প্রকার ভেদ, (৩) দেশীয় রাজ্যগুলির কৃষি-অভ্যাস এবং আবহাওয়ার ভিন্নতা, (৪) কৃষিঋণ মকুব, (৫) সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য, (৬) কৃষিনীতি এবং কৃষি প্রযুক্তির হস্তান্তর এবং (৭) অর্থনীতিতে কৃষিঋণ মকুবের বিরূপ প্রভাব।

কৃষিঋণ মকুব নিয়ে যে রাজনীতি এখন চলছে সেটা রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ পর্যন্ত যত টাকা মকুব করা হয়েছে তাতে একবার চোখ বোলালে যে-কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আঁতকে উঠবেন। অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা এবং রাজস্ব ঘাটতির ব্যাপারে কারোও কোনও মাথাব্যথা নেই।

কৃষকদের শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর প্রয়াস অনেকদিন ধরেই চলছে। আমাদের দেশে নানা ধরনের চাষি আছে। যারা ২ একর বা তার থেকে কম জমি চাষ করেন তাদের ক্ষুদ্র চাষি বলে। যারা ৫ একর জমি চাষ করেন তারা প্রান্তিক চাষি এবং যারা ১০ থেকে ২০ একর জমি চাষ করেন তারা মধ্যমমানের চাষি। যাদের চাষের জমি ২০ একরের বেশি তারা বৃহৎ চাষি। এরপর আছে কর্পোরেট ফার্মগুলি। এরা সাধারণত চারা রোপণ এবং বীজ প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে থাকে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে সব চাষি 'গরিব' নন। ঠিক যে কথাটা কৃষিঋণ মকুবের দাবিদারেরা বলে থাকেন। আজকাল যারা কৃষিজমির মালিক তারা খুব কম ক্ষেত্রেই নিজেরা চাষ করেন। চাষের দায়িত্ব বর্তায় জমিহীন 'ভাড়াটে' চাষিদের ওপর। পি. চিদাম্বরম এবং তার দল সুকৌশলে এই 'ভাড়াটে' চাষিদের কথা এড়িয়ে গেছেন। কারণ সকলেই জানেন নিজের জমি না থাকলে কোনও কৃষক ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে পারেন না। তাকে ঋণ নিতে হয় মহাজনদের কাছ থেকে, বার্ষিক ১৮ থেকে ৩০ শতাংশ সুদে।

ভারতে উৎপাদিত প্রধান খাদ্যশস্য ধান, গম, যব আর ভুট্টা। ডালের মধ্যে রয়েছে মুগ, মুসুর অড়হর সোয়া ইত্যাদি। তারপর তামাক, বাদাম, সরষে, আদা, কফি, চা, রবার, নারকেল ইত্যাদি। আবহাওয়ার দিক থেকে কৃষিকাজে প্রধান বাধা বন্যা, খরা, সাইক্লোন, তুষারপাত। বলা হচ্ছে, কৃষকদের সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। অর্থাৎ আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা। কিন্তু আবহাওয়ার অনিশ্চয়তাজনিত

ফঃ ৬

সমস্যার চরিত্র এবং ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা একেক ধরনের চাষিদের ক্ষেত্রে একেকরকম। ভিন্ন ভিন্ন শস্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মরু অঞ্চল বা অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলা যেখানে বৃষ্টি কম হওয়ার কারণে সাধারণত প্রত্যেক তিন বছর অন্তর খরা হয় সেখানকার সঙ্গে নিশ্চয়ই পঞ্জাব হরিয়ানা বা অন্যান্য নদনদী সমৃদ্ধ অঞ্চলের তুলনা হতে পারে না। সুতরাং কৃষি ঋণ মকুব করার দাবিটি কৃষকদের সার্বিক শ্রেণীবিন্যাস, শস্য উৎপাদনের ভিন্নতা এবং আবহাওয়ার বৈচিত্র্যের নিরিখে বিচার করা দরকার। কৃষি বিষেষজ্ঞরা ব্যাঙ্কঋণ এবং কৃষিঋণ মকুবের শর্তাবলী পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে ড. এম. এস. স্বামীনাথন কমিশনের রিপোর্ট পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, রিপোর্টের সুপারিশগুলি সেইভাবে বাস্তবায়িত করা হয়নি।

কৃষিলবির তোলা কৃষিঋণ মকুবের দাবির যুক্তি খুবই সরল। সরকার যখন বহুজাতিক সংস্থাগুলির নেওয়া ঋণে এবং প্রদেয় করে নানারকম ছাড় দিচ্ছে তখন কৃষিঋণ মকুব করে দিলে দোষ কী? বিশেষ করে যেখানে 'গরিব' চাষিরা সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য পর্যন্ত ঠিকমতো পান না। আজকাল সব ধরনের চাষিরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেন। প্রশ্ন উঠবে, কেন? কারণ গ্রামের সরপঞ্চরা চাষিদের ঋণ নেওয়ার ব্যাপারে লোভনীয় 'অফার' দেন। তারা বলেন বন্যা বা খরা হলে (ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলে যা প্রায়ই হয়) ঋণ মকুব হয়ে যাবে। জমির মালিকানা নিয়েও কোনও প্রশ্ন উঠবে না। তাছাড়া সুদের হারও প্রায় নগণ্য। এর ফলে আমরা কী দেখছি? তেলেঙ্গানা রাজ্যে চাষিদের ব্যাঙ্কঋণ নিয়ে কেউ যদি সমীক্ষা করেন, দেখতে পাবেন, সেখানকার চাষিরা ঋতুবন্ধু প্রকল্পে প্রত্যেক বছর শস্যপ্রতি ১০,০০০ টাকা অনুদান পাওয়ার পরেও ব্যাঙ্কঋণ নেন। এরপরও আর একটা গুরুতর প্রশ্ন থেকে যায়। কোন যুক্তিতে কর্পোরেট ফার্ম এবং বীজ প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাগুলিকে ঋণ মকুবের সুবিধা দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে? এরাও কি 'গরিব' চাষি? তেলা মাথায় তেল না দিয়ে যেসব শস্য উৎপাদনে ব্যাঙ্কঋণ দেওয়া হয় না তাদের যদি ঋণ মকুবের সুবিধা দেওয়া হতো সেটা বরং বেশি যুক্তিযুক্ত হতে পারত। কিংবা ধরা যাক সেইসব শহুরে নাগরিকদের কথা। গ্রামে এদের কৃষিজমি রয়েছে। সেইসব জমি চাষ করেন 'ভাড়াটে' চাষিরা। কিন্তু এরা নামমাত্র সুদে ব্যাঙ্ক থেকে কৃষিঋণ নিয়ে রিয়েল এস্টেট বা অন্যান্য লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। এদের চাষি হিসেবে ধরে নিয়ে কৃষিঋণ মকুব করে দেওয়ার থেকে বড়ো ধাপ্পা আর কী হতে পারে? যেসব চাষি প্রায় নিখরচায় সেচের সুবিধা পান এবং বছরে দু'-তিন রকমের শস্য উৎপাদন করেন তাদের ঋণও মকুব করে দেওয়া উচিত কিনা ভেবে দেখা দরকার।

কৃষিঋণ মকুবের পক্ষে আরেকটি জোরালো যুক্তি হলো অতিরিক্ত ফলন এবং তার জন্য কৃষকের ফসলের উচিত-দাম না পাওয়া। এ ব্যাপারে সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্যের বিষয়টি আগেই ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্যই চাষিদের সমস্যার সমাধান নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ২০০৪ থেকে অক্টোবর ২০০৬— এই সময়ে চাষিদের সমস্যা বাড়ছিল এবং বেশ কয়েকজন চাষি আত্মহত্যাও করেছিলেন। সরকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য ড. এম. এস স্বামীনাথনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। কী ছিল কমিটির রিপোর্টে? চাষিদের সমস্যা দূর করার জন্য কমিটি ভূমি সংস্কার, সেচ, ঋণ ও বিমা, খাদ্য সুরক্ষা, কর্মসংস্থান, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং কৃষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার।

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে ফসলের মোট উৎপাদন খরচের অন্তত ৫০ শতাংশ সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য হিসেবে চাষিকে ফিরিয়ে দেবার কথা ঘোষণা করেছে মোদী সরকার। এবং এটা করা হয়েছে স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ মেনেই। কিন্তু কথাটা কোনও বিরোধী নেতা বলছেন না। বস্তুত, কৃষিঋণ মকুব নয়, ভারতের চাষিদের বাঁচাতে হলে দেশের সর্বত্র গ্রিন হাউস প্রযুক্তির সম্প্রসারণ প্রয়োজন। ঠিক যেমনটি হয়েছে স্পেনের আলমেরিয়ায়। প্রয়োজন

শ্রীমতী দীপ্তি ব্যানার্জী

জন্ম : ১৭.০৪.১৯৫৪

মৃত্যু : ১৪.১১.২০১৮

শ্রীমতী দীপ্তি ব্যানার্জীর জন্ম অধুনা বাংলাদেশের পাবনা জেলার কালাঁচাদ পাড়ায়। পিতা অমূল্যচন্দ্র রায় ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রের পণ্ডিত। তাঁর নিজস্ব টোল ছিল। আই এ পাশ করার পর ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাবার সঙ্গে পদব্রজে ভারতে আসেন। যাত্রাপথে যে নির্মম নিষ্ঠুরতার শিকার হতে হয়েছিল পরবর্তীকালে তাঁর লেখাতে তা প্রতিফলিত হয়। ১৯৭৪ সালের ২রা বৈশাখ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্যারাকপুর মহকুমার বর্তমান সঙ্ঘচালক ড: জগন্নাথ ব্যানার্জীর সঙ্গে বিবাহের দিন থেকেই সঙ্ঘের কর্মযজ্ঞে নিজেকে শামিল করেন। উত্তর দমদম নগরের তাঁদের বাসগৃহটি সঙ্ঘের অঘোষিত কার্যালয়ে পরিণত হয়। মাননীয় কেশবজী, মতিজী, রথীনদা, রনেনদা, রাধাগোবিন্দদা, শ্যামাদা, রমাদা এবং আরও অনেক কার্যকর্তার চরণধূলি পড়ে এই বাড়িতে। প্রত্যেককে তিনি এক পরম আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে নিতেন। উত্তর দমদম এবং পার্শ্ববর্তী নগরগুলোর স্বয়ংসেবকদের কাছে তিনি ছিলেন মাতৃস্বরূপা। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক এবং গীতিকার। তাঁর স্বরচিত গান ও কবিতা স্বয়ংসেবকদের উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়। তিনি রাষ্ট্রীয় সেবিকা সমিতির কর্মযজ্ঞেও নিজেকে সামিল করেছিলেন। গত ১৪ নভেম্বর, ২০১৮ তাঁর আকস্মিক প্রয়াণ এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করে। তাঁর দুই স্বয়ংসেবক পুত্র মায়ের আদর্শকে সামনে রেখে হিন্দুত্বের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন।

Advt.

কৃষক এবং ক্রেতার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা। আমাদের দেশের চিরাচরিত বিপণন পদ্ধতি অর্থাৎ নিলাম ঘর থেকে বিপণন কেন্দ্র তারপর ব্রোকার-রিটেইলারের মাধ্যমে ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়া— অচল হয়ে গেছে। ফড়ে আর দালালরা এই সুযোগে চাষিদের শোষণ করছে। তারা চাষিদের কাছ থেকে আনাজ কিনছে ২ টাকা প্রতি কেজি দরে আর ক্রেতাকে বিক্রি করছে ২০ টাকা প্রতি কেজি দরে।

এ ব্যাপারে যথেষ্ট সদর্থক উদ্যোগ নিয়েছে মোদী সরকার। ২০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এগ্রি-মার্কেট ইনফ্রাস্টাকচার ফান্ড গঠন করা হয়েছে। এই টাকায় সারা দেশ জুড়ে ২২,০০০ মন্ডি তৈরি হয়েছে। দেখাশোনার দায়িত্বে গঠন করা হয়েছে ৫৮৫টি এগ্রিকালচারাল প্রোডিউস মার্কেট কমিটি। এর ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেখানে বাজারের সুবিধে নেই সেখানকার চাষিরা মন্ডির মাধ্যমে সরাসরি ক্রেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন।

সব শেষে একটা কথা বলতেই হয়। কৃষিঋণ মকুব নিয়ে যে রাজনীতি এখন চলছে সেটা রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ পর্যন্ত যত টাকা মকুব করা হয়েছে তাতে একবার চোখ বোলালে যে-কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আঁতকে উঠবেন। অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা এবং রাজস্ব ঘাটতির ব্যাপারে কারোও কোনও মাথাব্যথা নেই। তেলেঙ্গানায় বরাবরই লক্ষ্যমাত্রার থেকে বাড়তি রাজস্ব জমা পড়ে কিন্তু এবার কৃষিঋণ মকুবের ঠেলায় ঘাটতি দেখা দেবে।

ওদিকে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিংহ ঘোষণা করেছেন, তার সরকার কৃষকদের ঋণ মকুব করে দেবে। পঞ্জাবে বিধিবদ্ধ কৃষিঋণ ৬৭,০০০ কোটি টাকা। পঞ্জাব সরকার এখনও পর্যন্ত ১৭৫০ কোটি টাকার ঋণ মকুব করেছে। চাষিদের নেওয়া ঋণ মকুব করেছে। চাষিদের নেওয়া মোট ঋণ থেকে ২ লক্ষ টাকা করে বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যিনি ৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন তাকে শোধ করতে হবে ৩ লক্ষ টাকা। বাকি ২ লক্ষ টাকা দেবে রাজ্য সরকার। শর্ত একটাই, সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে

কোন যুক্তিতে কর্পোরেট ফার্ম এবং বীজ প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাগুলিকে ঋণ মকুবের সুবিধা দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে? এরাও কি 'গরিব' চাষি? তেলা মাথায় তেল না দিয়ে যেসব শস্য উৎপাদনে ব্যাঙ্কঋণ দেওয়া হয় না তাদের যদি ঋণ মকুবের সুবিধা দেওয়া হতো সেটা বরং বেশি যুক্তিযুক্ত হতে পারত।

ঋণ নিলে তবেই হবে ঋণ মকুব। এবং একমাত্র প্রান্তিক চাষিরাই এই সুযোগ পাবেন। পঞ্জাবে এখন দ্বিতীয় পর্যায়ের ঋণমকুবের কাজ শুরু হওয়ার পথে। এবার যারা রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছেন তাদের এই সুবিধে প্রদান করা হবে। সর্বমোট ১,৭৭১ কোটি টাকার ঋণ মকুব করা হবে। এবং এবারও শুধুমাত্র প্রান্তিক চাষিদের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে। ক্ষুদ্র চাষি অর্থাৎ ২ একরের কম জমিতে চাষাবাদ করেন তাদের এখনও অপেক্ষা করতে হবে। আগামী বছরের জুন-জুলাই নাগাদ তাদের কথা ভাবা হতে পারে। কর্ণাটকেও শুরু হয়েছে ঋণমকুবের প্রক্রিয়া। যাদের ঋণ মকুব করা হবে তাদের নামের তালিকা তৈরির কাজ শেষ। মোটামুটি লোকসভা নির্বাচনের সময় শুরু হবে সার্টিফিকেট দেওয়ার কাজ।

ঢালাও কৃষিঋণ মকুব করার সব থেকে ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে দেশের আর্থিক সূচকের (জিডিপি) ওপর। ইতিমধ্যেই জানা গেছে গ্রস জডিপি-তে রাজ্যগুলির আর্থিক দায় বাড়ছে। অর্থাৎ জনমোহিনী নীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে নানারকম ছাড় এবং অনিয়ন্ত্রিত খরচের ঠেলায় রাজ্যগুলি জিজিপি-কে পুষ্ট করতে পারছে না। পঞ্জাবের আর্থিক দায় এখন ৩৩ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশের ২৫ শতাংশ।

এর ফলে পতন অনিবার্য। একথা কেউ স্বীকার করছেন না, কৃষিঋণ মকুব করে ভোট কুড়নোর রাজনীতি করা সম্ভব হচ্ছে জোরানো অর্থনীতির কারণে। কিন্তু ঋণমকুবের সুদূরপ্রসারী প্রভাবে অর্থনীতি একসময় দুর্বল হতে বাধ্য। সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের কৃষকেরা এবং ব্যাঙ্কগুলি। নীতি আয়োগ ইতিমধ্যে ঋণমকুব নীতির বিরোধিতা করেছে। তাদের যুক্তি, সারা দেশে যদি দেখা হয় মোট কতজন চাষি ব্যাঙ্কঋণ শোধ করতে না পেরে কষ্টের মধ্যে আছেন, তাহলে দেখা যাবে তাদের সংখ্যা মোট কৃষকসংখ্যার ৫০ শতাংশও নয়। অর্থাৎ এই যে ঋণমকুবের কয়েক লক্ষ কোটি টাকা খরচ করার কথা চলছে তাতে দেশের ৫০ শতাংশ কৃষকও উপকৃত হবেন না। তাহলে কারা হবেন? কাদের স্বার্থে এই দাবি? ঋণমকুবের দাবিদারদের এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার দায় রয়েছে। তারা ঋণমকুব নিয়ে ক্রমাগত কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। সেটাও বন্ধ করা দরকার। যেহেতু কৃষি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়, তাই কৃষিঋণ মকুবের বিষয়টিও রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে পড়ে। এ ব্যাপারে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের কোনও দায় নেই।

(সৌজন্য : নিউজ ভারতী)

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় নাসিরুদ্দিন শাহ্

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিতর্কিত মানবাধিকার রক্ষা সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বিরুদ্ধে বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ নতুন নয়। বিষয়টি এখন ইডির তদন্তাধীন। তাই নিজেদের পিঠ বাঁচাতে সংস্থাটি সম্প্রতি অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহকে মাঠে নামিয়েছে। অ্যামনেস্টি প্রকাশিত একটি ভিডিওতে নাসিরুদ্দিন ভারতের নেতিবাচক ছবি তুলে ধরে দেশের আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার অভিযোগ করেছেন।

নাসিরুদ্দিনের সাহায্যে অ্যামনেস্টির এই ভিডিও প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য, সংবিধান প্রদত্ত মানবাধিকার যে আজকের ভারতে ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন যেটা দেখানো। কারণ নাসিরুদ্দিন বলেন, 'আমরা যে দেশে বাস করি সেখানে সত্যি কথা বললে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলে বিপদ বাড়ছে। সৎ ন্যায়নিষ্ঠ সাংবাদিকদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে।'

গত মাসেও তিনি আজকের ভারতে তাঁর সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন নাসিরুদ্দিন। সারা দেশ তাঁর অমূলক এবং কাল্পনিক শঙ্কার প্রতিবাদ

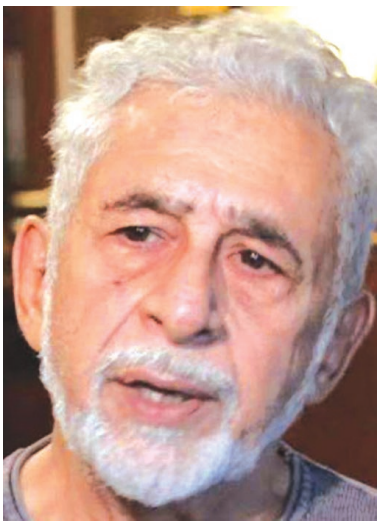

করেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পরই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বিদেশি ফান্ডিং সম্বন্ধে নানা অনিয়ম প্রকাশ্যে আসে। অ্যামনেস্টি-সহ কয়েক হাজার এনজিও-কে তদন্তের আওতায় আনা হয়। অ্যামনেস্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘন করে অনৈতিক উপায়ে বিদেশি মুদ্রা সংগ্রহ করেছে। সুতরাং নাসিরুদ্দিনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার পিছনে তাদের কী স্বার্থ রয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনে নথিভুক্ত এনজিও-ই বিদেশি অর্থের তহবিল তৈরি করতে পারে। যেসব সংস্থা নথিভুক্ত নয় তারা যদি তহবিল গড়তে চায় তাহলে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের অনুমতি প্রয়োজন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নথিভুক্ত সংস্থাও নয়, আবার তাদের কাছে প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমতিও ছিল না। এমনই এক বেআইনি কাজকর্মে লিপ্ত সংস্থার হয়ে মাঠে নেমে দেশকে কলঙ্কিত করেছেন নাসিরুদ্দিন।

ওয়াকিবহাল মহলের অভিযোগ, 'আরবান নকশাল' অরুণ ফেরেইরার অভিযোগ উদ্ধৃত করে এর আগেও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তাদের ওয়েবসাইটে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। সেই নিবন্ধেও প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল যে মানবাধিকার কর্মীদের কাছে ভারত ক্রমশ বিপজ্জনক দেশ হয়ে উঠছে। বস্তুত, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে আরবান নকশালদের বকলমে মাওবাদীদের সুসম্পর্কের কথা অনেকেই জানেন। নাসিরুদ্দিনও কি মাওবাদীদের সঙ্গে যুক্ত? এখন সেটাই জানতে চাইছেন সবাই।

গত চার বছরে চাইল্ড হেল্প লাইন যোগাযোগের সংখ্যা তিন গুণ বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত চার বছরের মধ্যে চাইল্ড হেলপ্ লাইন নম্বর যোগাযোগের সংখ্যা তিন গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে ১০৯৮ নম্বরে প্রায় ৩৮ লক্ষেরও বেশি ফোন এসেছে। ২০১৭-১৮-তে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লক্ষ ১৫ হাজারেরও বেশি। প্রাপ্ত ফোন কলগুলির মধ্যে প্রায় ৭ লক্ষ ৯ হাজার বার চিকিৎসাজনিত সাহায্য, আশ্রয়, পুনর্বাসন, হেনস্থার হাত থেকে রক্ষা, অর্থ সাহায্য ইত্যাদি কারণে করা হয়েছে। শিশু বিচার (শিশুদের পরিচর্যা ও রক্ষা) আইন,

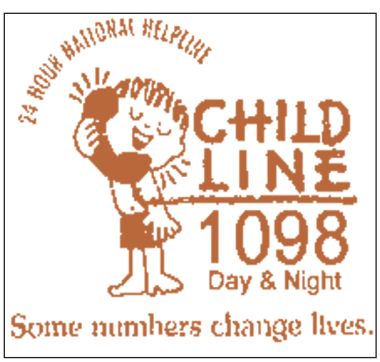

২০১৫-র শর্ত অনুযায়ী চাইল্ড হেলপ্ লাইনকে সুরক্ষাজনিত পদক্ষেপ নিতে হয়। একটি শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সহায়তার ভিত্তিতে সাহায্য প্রদান করা হয়।

এই ফোন কলগুলির মধ্যে কেবল ২ লক্ষ ১৮ হাজার ২৬৬টি মামলায় প্রত্যক্ষভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেইসব ক্ষেত্রে যথাযথ আইন অনুযায়ী পরিষেবা প্রদানকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে শিশুদের তৎক্ষণাৎ সাহায্য করা হয়েছে। আজ লোকসভায় এক প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য দেন কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী বিজয় কুমার।

রাজস্থানে কৃষিঋণ কেলেঙ্কারি, তদন্তের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহ্‌লট রাজ্যের সব কৃষকের ঋণ দু' লক্ষ টাকা পর্যন্ত মকুব করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সরকার সেই মতো কাজও শুরু করেছিল। কিন্তু দুর্নীতির পাঁকে আকণ্ঠ ডুবে থাকা কংগ্রেস কতক্ষণই বা সভ্য জগতের রীতি মেনে কাজ করতে পারে! রাজস্থানের মানুষ ইতিমধ্যেই কৃষিঋণ মকুবের নামে আর্থিক কেলেঙ্কারির সন্ধান দিতে বাধ্য হয়েছে। স্থানীয় কৃষকমহলের অভিযোগ, কৃষিঋণ মকুবের যে তালিকা সরকার প্রকাশ করেছে তাতে বহু ভুয়ো কৃষকের নাম রয়েছে।

জনজাতি অধ্যুষিত দুঙ্গারপুর জেলার কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে বলা দরকার। এই জেলার ১৭০০ জন কৃষক রয়েছেন যারা ঋণ নেননি অথচ তাদের স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছে স্থানীয় একটি সমবায় ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, কংগ্রেস ঋণমকুবের কথা ঘোষণা করার পরই তারা স্বল্পমেয়াদি ঋণের কিছু পুরনো আবেদনপত্র মঞ্জুর করেন। রাজস্থানের গউয়াডিতেও একইরকম ঘটনা ঘটেছে। সেখানে ১৭৮০ জন কৃষককে মোট আট কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছে স্থানীয় সমবায় ব্যাঙ্ক। প্রতিবাদে সেখানকার কৃষকেরা জেলাশাসকের কাছে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি করেছেন। বিপদ বুঝে সরকার তরিঘড়ি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে বরখাস্ত করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানে সর্বমোট ৬ লক্ষ কোটি টাকার কৃষিঋণের মধ্যে মাত্র ৬০ কোটি টাকা এখনও পর্যন্ত মকুব করা হয়েছে। সিএজি রিপোর্ট অনুযায়ী এই ৬০ কোটি টাকার মধ্যে ৩৫ লক্ষ টাকা কোনও কৃষক পাননি।

এখন প্রশ্ন হলো, কৃষকেরা যদি না পেয়ে থাকেন তাহলে টাকাটা কোথায় গেল? এ প্রশ্নের উত্তর জানা যায়নি। তবে ভুক্তভোগী মহলের অভিমত, এসব কংগ্রেসের পুরনো খেলা। দুর্নীতি ব্যতিরেকে দেশের শতাব্দীপ্রাচীন দলটি ছোটোবড়ো কোনও প্রশাসনই চালাতে পারে না। তিন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে জেতার এক মাসের মধ্যে এই অনিয়ম বুঝিয়ে দিচ্ছে আগামী পাঁচ বছর কেমন যেতে পারে।

দেশের ৬৪০টি জেলাতে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চলতি লোকসভায় এক প্রশ্নের জবাবে মহিলা ও শিশুবিকাশ প্রতিমন্ত্রী ড. বীরেন্দ্র কুমার জানান, শিশু লিঙ্গ অনুপাতজনিত সমস্যার সমাধান ও কন্যা শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব করাই 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। সেজন্য নির্বাচিত কয়েকটি জেলায় এই প্রকল্পের আওতায় একাধিক উদ্যোগের মাধ্যমে সংশোধনী ও সমাধানমূলক কর্মসূচি পালন করা হয়। শিশু লিঙ্গ অনুপাত মন্ত্রক 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্পের প্রভাব সম্বন্ধে কোনও মূল্যায়ন করেনি। তবে, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক থেকে প্রাপ্ত ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের ১৬১টি জেলার তথ্য থেকে দেখা গেছে যে, ১০৪টি জেলায় ক্ষেত্রেও উন্নতি ঘটেছে এবং ১৪৬টি জেলায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের সংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' ২০১৫-র প্রকল্প সে বছর ২২ জানুয়ারি চালু করা হয় যাতে শিশু লিঙ্গানুপাতের বৈষম্য দূর হয় এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে উন্নতি আসে। মূল বিষয় হলো, শিশুকল্যাণ এবং মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রক একত্রিতভাবে এই প্রয়াস। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য দেশ জুড়ে এই সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রচার কর্মসূচি এবং একাধিক ক্ষেত্রের মাধ্যমে এই লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া। ২০১৮-১৯ থেকে দেশের মোট ৬৪০টি জেলা (২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী) এই কর্মসূচির আওতায় এসেছে। তার মধ্যে ৪০৫টি জেলায় একাধিক ক্ষেত্রের মাধ্যমে কাজ করা হয় এবং প্রচার কর্মসূচিও হাতে নেওয়া হয়েছে। ২৩৫টি জেলায় গণমাধ্যম ও প্রচারমূলক অভিযানের মাধ্যমে প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' কর্মসূচির জন্য মোট ২৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮-র প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এর মধ্যে ৭০ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা রাজ্য/জেলাগুলিকে কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য দেওয়া হয়েছে এবং ১৫৫ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা গণমাধ্যম কর্মসূচি খাতে দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী উজ্জলা যোজনায় ছয় কোটির বেশি রান্নার গ্যাস বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী উজ্জলা যোজনায় ৬ কোটির বেশি মানুষকে রান্নার গ্যাস বিতরণ করা হয়েছে। নতুন দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু যোজনার সুফলভোগী দিল্লির শ্রীমতী জসমিনা খাতুনের হাতে নতুন রান্নার গ্যাস সংযোগের নথিপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী নাইডু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানের সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করে ৬ কোটিরও বেশি রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তেল বিপণন সংস্থাগুলির সমবেত প্রয়াসের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। দরিদ্র মানুষ বিশেষ করে, সমাজের অবহেলিত মানুষের স্বার্থে গান্ধীজীর স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এই যোজনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি আরও বলেন, ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে ওঠার পথে অগ্রসর হচ্ছে। সেদিক থেকে সামাজিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী উজ্জলা যোজনার মতো প্রকল্পগুলি সার্বিকভাবে অপরিহার্য হয়ে উঠছে। প্রধানমন্ত্রী সংস্কার, সুচারু রূপে কাজকর্ম সম্পাদন এবং পরিবর্তনের যে ডাক দিয়েছেন--- তা বাস্তবায়িত করতে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের এই উদ্যোগ সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের মানোন্নয়নে এক বিরাট পদক্ষেপ। নির্ধারিত সময়ের আগেই রান্নার গ্যাস বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে শ্রী নাইডু সংশ্লিষ্ট পক্ষের ভূমিকার প্রশংসা করেন। উল্লেখ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু গৃহস্থালীর দরুন সৃষ্ট দূষণের হাত থেকে মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রধানমন্ত্রী উজ্জলা যোজনার প্রশংসা করেছে।

পাটজাত সামগ্রীর রপ্তানি চব্বিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে : স্মৃতি ইরানি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাটজাত সামগ্রীতে বৈচিত্র্য আনার পর ২০১৪ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী রপ্তানি ২৪ শতাংশ বেড়েছে। কলকাতায় সংস্কারের পর নবরূপে সজ্জিত ওল্ড কারেন্সি বিল্ডিংয়ে আয়োজিত পাটজাত সামগ্রীর প্রদর্শনী সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানে একথা জানান কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী শ্রীমতী স্মৃতি ইরানি। পাটজাত সামগ্রী প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে মন্ত্রকের পক্ষ থেকে চার দিনের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে শ্রীমতী ইরানি পশ্চিমবঙ্গে পাটশিল্পের বিকাশে বিপুল সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। এক অর্থকরী কৃষিজ পণ্য হিসাবে পাটসামগ্রী বহু বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক অগ্রগতিতে অবদান জুগিয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

কেন্দ্রীয় সরকার পাটচাষী, শিল্প সংস্থা এবং রপ্তানিকারীদের স্বার্থে সহযোগিতা গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, পাট চাষিদের উপার্জন বৃদ্ধির পাশাপাশি, পাট শিল্পে আরও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ওপর সরকার নজর দিচ্ছে।

কেন্দ্রীয় বস্ত্রসচিব রাঘবেন্দ্র সিংহ বলেন, বড়ো বড়ো সংস্থাগুলির সঙ্গে তন্তুবায়দের যোগসূত্র গড়ে তুলে তাঁদের আয় বৃদ্ধির ওপর মন্ত্রক গুরুত্ব দিচ্ছে। দেশের ৪০টি জেলার তন্তুবায়দের বিমা ও উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাতকরণে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

নবোদয় বিদ্যালয়ে বাড়তি আসনের প্রস্তাবে মন্ত্রীসভার অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গ্রামের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনায় গতি আনতে সদর্থক পদক্ষেপ নিল মোদী সরকার। সম্প্রতি মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে জওহর নবোদয় বিদ্যালয়গুলিতে ৫০০০ আসন বাড়ানো হবে। মন্ত্রীসভার বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এখন নবোদয় বিদ্যালয়গুলিতে ৪৬,০০০ আসন রয়েছে। ৫০০০ আসন বাড়লে ৫১,০০০ হবে। উল্লেখ্য, মোদী সরকারের আমলে মোট ১৪,০০০ আসন বৃদ্ধি হয়েছে, যা সর্বকালীন রেকর্ড। আগামী চার বছরে সরকার আরও ৩২,০০০ আসন বৃদ্ধি করতে চায়। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রভাস জাভড়েকর বলেন, 'আমরা সঠিক দিশায় এগিয়ে চলেছি। নবোদয় গ্রামের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ায় উৎসাহী করে তুলবে। গ্রামের প্রতিভাবান ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় অনেকটাই দূর হবে।' মন্ত্রী আরও জানান, বিভিন্ন রাজ্যে যেসব নতুন জেলা হয়েছে সেখানে একটি করে নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। নবোদয় বিদ্যালয়ের সুবিধা হলো, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জন্য এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসা যায়। ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়ার জন্য ৩১.১০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করেছে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

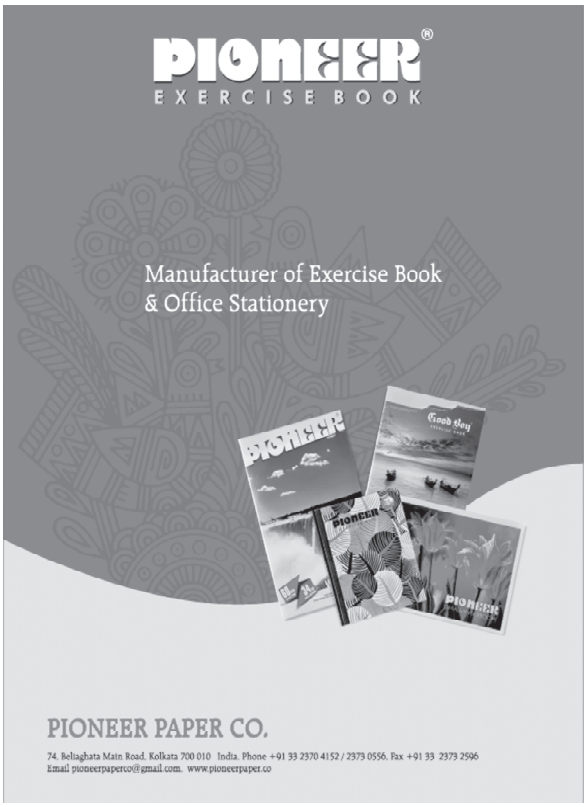

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

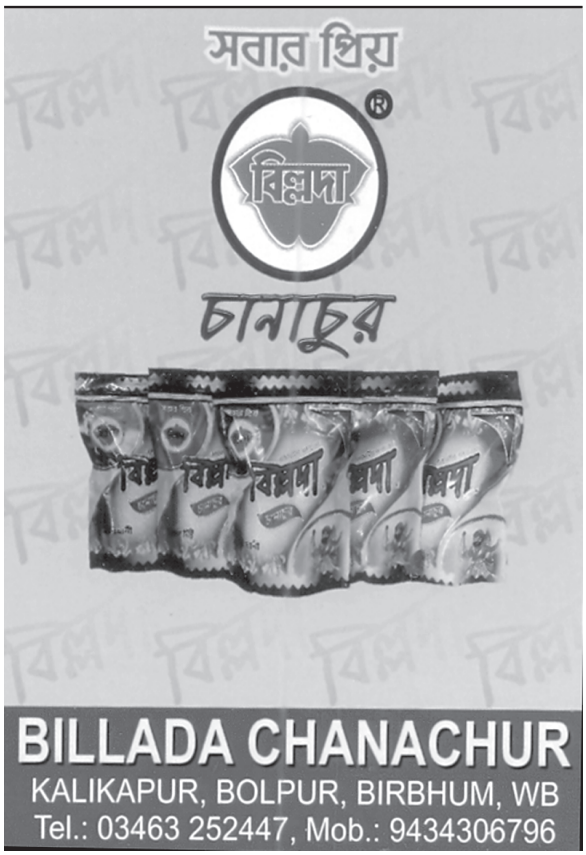

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

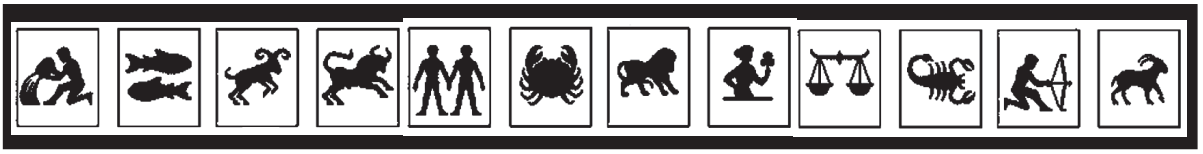

১৪ জানুয়ারি (সোমবার) থেকে ২০ জানুয়ারি (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি-শুক্র, ধনুতে রবি-বুধ-শনি, মকরে কেতু এবং মীনে মঙ্গল। সোমবার রাত্রি ১০-৫০ মিনিটে রবির মকরে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মীনে রেবতী নক্ষত্র থেকে মিথুনে অবরুদ্ধ নক্ষত্রে।

মেষ : জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা, সমাজকল্যাণে দীপ্ত পদচারণা ও প্রতিভার স্বাভাবিক বিচ্ছুরণ। আইনজ্ঞ, প্রযুক্তিবিদ্ ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পেশাগত উন্নতি ও আর্থিক দক্ষতায় শংসা প্রাপ্তি। মাতার শরীরের কারণে গৃহসুখ বিনষ্ট।

বৃষ : দায়িত্ব বৃদ্ধি, গহনা, গ্রহরত্ন, পুস্তক, ওষুধ ব্যবসায়ীদের আর্থিক সাফল্য। দুজন প্রতিবেশী ও ছলনাময়ীর দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। প্রিয়জনের বিবাহ ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে জ্ঞানী ও সাত্ত্বিক ব্যক্তির সান্নিধ্যে প্রশান্তি। সাংসারিক সুখ-সার্বিক হৃদ্যতাও আর্থিক পরিকাঠামো সুদৃঢ় থাকবে। লিভারের চিকিৎসা ও অহেতুক ভ্রমণে ব্যয়।

মিথুন : চিন্তা-চেতনায় দোদুল্যমানতায় বিদ্যা ও কর্মে প্রতিবন্ধকতা ও সময়ের অপচয়। পরিবারের প্রধানের বিসদৃশ আচরণ, কটুবাক্যে স্বজন সম্পর্কে অবনতি। উত্তরাধিকার ও হারানো দ্রব্য প্রাপ্তি। বাড়ি-গাড়ি ক্রয়ের শুভ ইঙ্গিত। খনিজ, পরিবহণ, কাঠ ও চর্ম ব্যবসায়ীর বিত্ত ও আভিজাত্য গৌরব।

কর্কট : সরলতায়পূর্ণ মূল্যায়নের আশা কম। কূটনীতিজ্ঞ, আইনজ্ঞ ও কৌশল মনোভাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন তবে মানসিক অতৃপ্তভাব, আধ্যাত্মিক জীবনে আগ্রহী করে তুলবে। গৃহিণীর পেশাগত উন্নতি ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি, সপ্তাহের শেষভাগে অমিতব্যয়িতায় বিহ্বল চিত্ত ও রক্তচাপ বৃদ্ধি।

সিংহ : মামলা মোকদ্দমায় ইতিবাচক ফল। কর্মস্থলে ভুল ভ্রান্তিতে বদলি অথবা সংস্থাগত পরিবর্তন। কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যা ও ব্যবসায় পুনর্বিনিয়োগ ধনাগম, সামাজিক সম্মান ও প্রভাব। প্রতিপত্তি লাভ। বিদ্যার্থী, গবেষকের প্রতিভার স্ফুরণ ও সুপ্রসন্ন ভাগ্যের নব উন্মেষ। শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাত ও মহিলার কারণে সময়ের অপচয় ও সম্মান হানি।

কন্যা : বিদ্যার্থীর প্রাঞ্জল বুদ্ধি দৃঢ় আত্মীকরণ ও মনঃসংযোগে ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্তি ও জনকল্যাণমূলক কাজে বুদ্ধিদীপ্ত ও মানবিক পদক্ষেপ। স্ত্রীর দূরদর্শিতা ও মিষ্ট স্বভাব সাংসারিক ও সমাজিক অভিজাত্য বৃদ্ধি। সুন্দরের পূজারি। স্নেহপ্রবণ মন ও বান্ধবীর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি। হঠাৎ প্রাপ্তি।

তুলা : মানবিকতা, সহনশীলতা, রসিকতা, স্বীয় ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতায় নির্দিষ্ট পেশা ব্যতিত বিকল্প পথের সন্ধান। কৃষ্টি, সংস্কৃতি,দেব-দ্বিজে ভক্তি, আত্মীয়তা ও পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির যোগ। ভ্রাতা-ভগিনী, সন্তানের শিক্ষা ও কর্মসংক্রান্ত সফল উদ্যোগ প্রতিভার বিকাশ। মূত্রাশয় ও যকৃতেরপীড়ায় অস্বস্তি।

বৃশ্চিক : সুস্থ চিন্তা, দৃঢ় প্রত্যয়, বাকচাতুর্য, সৌন্দর্য সুধায়, মেধাবী ছাত্র, আদর্শ গৃহস্বামী, শিক্ষক অথবা সুদক্ষ পরিচালক। নাট্যব্যক্তিত্ব, অভিনেতা প্রযুক্তিবিদের সৃজনশীলতায় সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মান্যতা। স্ত্রীর ও বয়স্কদের অসুস্থতায় উদ্বেগ। কর্মক্ষেত্রে রমণীর কৌশলী মানসিকতা আর্থিক ক্ষতি। সন্তান-সন্ততির সৃষ্টির আনন্দ যজ্ঞে গৌরব বৃদ্ধি।

ধনু : বিদ্বান, কীতিমান, ভ্রমণ, ব্যবসায় প্রতিপত্তি, স্বার্থশূন্য, পরদুঃখকাতর, বাস্তব অনুভবী দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে আগ্রহী। ঋণমুক্তি তথা নির্বিকার চিত্তে সমাজকল্যাণে আত্মনিয়োগ ও বিশিষ্টজনের সাহচর্যে মানসিক প্রশান্তি। বিদ্যার্থীর ব্যস্ততা, চাঞ্চল্য ও মনঃসংযোগের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে ছলনাময়ীর রাহুগ্রাস।

মকর : শরীরের যত্নের সঙ্গে মানসিক অবসাদ ও ক্রোধ বর্জনীয়। চিন্তা-চেতনায় দূরদৃষ্টির অভাব ও নিন্দার দাবানলে মলিন বর্ণময় জীবন। আর্থিক ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন। প্রতিবেশীর সঙ্গে আইনি জটিলতা, ভুল বোঝাবুঝি ও বয়স্কদের বিরাগভাজন। সপ্তাহের প্রান্তভাগে অমানিশার অবসানে জীবনে নতুন সূর্যোদয়ের হাতছানি।

কুম্ভ : গৃহশ্রীর লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপাবর্ষণ, বাড়ি, গাড়ি, বস্ত্র, অলংকার, গৃহসজ্জায় বিলাসবহুল, আড়ম্বরপূর্ণ সুখী জীবন। শিল্পী, কলাকুশলী ও সাহিত্য পিপাসুদের সাধনায় দীপ্তি ও সৌন্দর্য সুধায় দৈবী কৃপালাভ, কর্মপ্রর্থীর নতুন কর্মলাভ অথবা পদোন্নতি। সহানুভূতি সমবেদনায় সাধুবাদ প্রাপ্তি।

মীন : স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতা ও যুবাদের কারণে মানসিক বিভ্রান্তি। আত্মীয় পরিজন গৃহের পরিবেশ ও সন্তান-সন্ততি, বুদ্ধিমত্তায় পরিচালনা করুন। সহদর বা নিকটতমের সৃষ্ট প্রতিকূল পরিবেশ। অভিমানের পরিবর্তে সমঝোতা অনেকাংশে শ্রেয়। ইমারতি দ্রব্য, প্রমোটারি, খনিজ দ্রব্যের ব্যবসার প্রসার ও আর্থিক প্রগতি। বয়স্ক মিত্র এড়িয়ে চলুন।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য